যমুনা।

(উপন্যাস।)

বর্দ্ধমান, গৌরডাঙ্গা-নিবাসী

শ্রীক্ষেত্রমোহন ঘোষ-প্রণীত।

কলিকাতা,— ৩৩৭ নং অপার চিৎপুর রোড,

বসন্ত লাইব্রেরী হইতে

শ্রীউপেন্দ্রনাথ পাল কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

CALCUTTA:

PRINTED BY NILMONEY DHUR. AT THE

Chaitanya Press.

No. 336 Upper Chitpore Road

1902.

প্রথম পরিচ্ছেদ।

শ্মশান-সৈকতে।

স৽

যত দিনান্তরবির হৈমরশ্মি শৈলপুরের শ্মশানঘাটে সিকতাভূনে

ডা, শত সহস্র হীরকখণ্ডের শোভা বিকীর্ণ করিতেছে। নিম্নে

মৃত্যুর ভমি বিধৌত করিয়া, হিন্দুর পুণ্যময়ী দুরিতবারিণী গঙ্গা

হইল—বাৎবক্ষে ধরিয়া বহিয়া যাইতেছে।

করিলেন। ত বালুকারাশির উপর চিরশান্তিময় শ্মশানশয্যায় আজি

অজয়কে আরথী গর্ব্বী জমিদার মুমূর্ষু দশায় শায়িত, অনন্তজলরাশি-

কুমার পিতার আহ্লাদের মত অনন্তের কোলে মিশিয়া যাইতে

অতি ধীরে ধীরে কহিলেন

অজয়ের চক্ষু দিয়া ত জমিদার হরগোবিন্দ চৌধুরী কিছুদিন

বাষ্পাবরুদ্ধকণ্ঠে জড়িতস্বরে উয়াছিলেন। বহুচিকিৎসায়ও রোগের

কোন উপশম হয় নাই। আজি অপরাহ্ণে ডাক্তার বাবু আসিয়া কহিলেন, "জীবনের আর কোন আশা নাই, সময় থাকিতে তীরস্থ কর।" চৌধুরী মহাশয় তখন অজ্ঞান—বাক্‌শক্তিবিরহিত।

ডাক্তার নিরঞ্জনবাবুর পরামর্শানুসারে চৌধুরী মহাশয়কে গঙ্গাতীরে আনা হইয়াছে। শ্মশানঘাট হইতে জমিদার মহাশয়ের বাটী বেশী দূর নয়।

বিপুল ধনসম্পত্তির অধীশ্বর আজি দীনদুঃখীর ন্যায় ধরাশয্যায় বিলুণ্ঠিত। পার্থিব ধন, মান, সম্পদ, রূপযৌবনের অন্তকারী—ধনী দরিদ্রে, বিদ্বান মূর্খে, উচ্চ নীচে, সুরূপ কুরূপে সাম্যসঞ্চারী শান্তিময় শ্মশান তুমি! তোমার কোলে আজি একজন বিপুল ধনরত্নের অধীশ্বর—সামান্য একজন ভিখারীর ন্যায় অনন্ত নিদ্রায় চক্ষু মুদ্রিত করিতে আসিয়াছেন। তোমার এখানে রূপের আদর নাই—ধনের অহঙ্কার নাই—জ্ঞানের গরিমা নাই—তোমার এখা[illegible] সবাই সমান। তুমি নির্বিকার। পুণ্যাত্মা মিলনে তে[illegible] সুখ নাই—পাপীর সংস্পর্শে তোমার ঘৃণা নাই—ধনীর সম[illegible] গর্বিত হও না কিংবা দীনহীন অতি হেয়তম নগণ্যজনের [illegible] তোমার বিকার জন্মে না। পুণ্যময়ী সতীকে যে কো[illegible] দাও—কুলটার জন্যও সেই আসন প্রসারিত। তো[illegible] প্রসারিত কোলে সংসারের সুখভোগে লালিত মহ[illegible] অগণ্য হরিগোবিন্দ চৌধুরী আজি চক্ষু মুদিয়া শা[illegible]

দুগ্ধশুভ্র কুসুমকোমল শয্যায় শুইয়া যাহা[illegible] চরমে তাহার এই অবস্থা। বালুকাশয্যা[illegible] মাথা রাখিয়া, অনন্তশক্তিময়ী পুণ্যদায়ি[illegible] মহাশয় কোন্ অনন্তপথের পথিক হ[illegible]

পার্শ্বে এক সুন্দর যুবক ম্লানমুখে বসিয়া আছেন। তাহার বয়ঃক্রম অষ্টাদশ বর্ষের অধিক বলিয়া অনুমান হয় না। কিয়দ্দূরে এক কিশোরী সঙ্কুচিতভাবে বসিয়া একবার মুমূর্ষুর মৃত্যুচ্ছায়াচ্ছন্ন মুখের দিকে চাহিতেছে, আবার যুবকের মুখের প্রতি সোৎসুক উদ্বিগ্ন দৃষ্টি সঞ্চালিত করিতেছে। যুবক চৌধুরী মহাশয়ের পুত্র, নাম অজয়কুমার; কিশোরীর নাম যমুনা, অজয়ের সহোদরা, বয়ঃক্রম বিংশ বর্ষের ন্যূন নহে। অভাগিনী বাক্‌শক্তি এবং শ্রবণশক্তি-বিরহিতা।

আত্মীয় স্বজন, কর্ম্মচারীবৃন্দ এবং গ্রামস্থ বহুলোকে আজি শ্মশানঘাট পরিপূর্ণ। কেহ আহুত হইয়া আসিয়াছে, কেহ বা অনাহুত অবস্থাতেই আসিয়াছে। আজি সকলে যে স্থানে সমবেত, সেখানে ধনী দরিদ্রে কোন প্রভেদ না থাকিলেও, পার্থিবসংস্কারে লোকচক্ষে উভয়ের মধ্যে স্বর্গমর্ত্ত্য প্রভেদ। সহায় সম্পত্তিশালী ধনাঢ্যের সৎকারে লোকের অভাব হয় না— যত অভাব দরিদ্রের বেলা।

ডাক্তার নিরঞ্জনবাবু রোগীর নাড়ী ধরিয়া বসিয়া আছেন। মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণে চৌধুরী মহাশয়ের একবার জ্ঞানের সঞ্চার হইল—বাক্‌শক্তি ফিরিয়া আসিল। ধীরে ধীরে নয়নোন্মীলন করিলেন। অজয়কুমার গঙ্গোদক পিতার মুখে দিলেন। তিনি অজয়কে আরও নিকটবর্ত্তী হইতে ইঙ্গিত করিলেন। অজয়-কুমার পিতার আরও সমীপবর্ত্তী হইলে, তিনি অতি অস্ফুটস্বরে, অতি ধীরে ধীরে কহিলেন, "অজয়! আমি চলিলাম!"

অজয়ের চক্ষু দিয়া অজস্র ধারা ঝরিল। হতভাগ্য যুবক বাষ্পাবরুদ্ধকণ্ঠে জড়িতস্বরে কহিল, "পিতা!" তাহার মুখ দিয়া

আর কথা বাহির হইল না। শোকাবেগে কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল। হরগোবিন্দ বিরক্তস্বরে বিরক্তির সহিত কহিলেন, "কাঁদিবার ঢের সময় আছে, এখন আমি যাহা বলিতেছি, মনোযোগ দিয়া শোন। তোমার ভগ্নী রহিল, দেখিও—হতভাগিনী বড়ই দুঃখিনী।"

অজয় কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "দিদিকে আমি প্রাণের সহিত ভালবাসি—আমার জীবন থাকিতে তাহার কোন কষ্ট হইবে না।"

চৌধুরী মহাশয়ের স্বাভাবিক গর্ব্বিত মুখশ্রী মৃত্যুচ্ছায়ায় একে বিকৃত হইয়াছে--তাহাতে অজয়ের এই কথায় আরও বিকৃত এবং অপ্রসন্ন হইল। কর্কশস্বরে কহিলেন, "তোমার সজ্জনতার পরীক্ষা দিতে আমি তোমায় ডাকি নাই। আমার চরণস্পর্শ করিয়া, এই গঙ্গাতটে বসিয়া শপথ কর—আমি যাহা বলিব, ভবিষ্যতে তাহা বর্ণে বর্ণে পালন করিবে।"

পিতার জীবিতকালে অজয় পিতার মুখে একদিনও একটা মিষ্ট কথা শুনে নাই—এখন এই মৃত্যুকালেও একবার একটা আদরের সম্ভাষণ শুনিতে পাইল না। তাহার হৃদয়ে দারুণ আঘাত লাগিল। সে পিতার পাদস্পর্শ করিয়া পিতার আদেশ পালন করিতে প্রতিশ্রুত হইল। কহিল, "আপনি আমার দেবতা—আমি আপনার চরমসময়ে আপনার চরণস্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি, বরং সংসারের সকল সুখ হইতে বঞ্চিত থাকিব, তথাপি আপনার আদেশ মুহূর্ত্তের জন্য অমান্য করিব না।"

সমবেত সকল লোক স্তম্ভিত। বৃদ্ধ ডাক্তারবাবু নির্ব্বাক হইয়া উপবিষ্ট, এক একবার কেবল যমুনার মুখের দিকে

চাহিতেছেন। হতভাগিনী উভয়করে মুখাচ্ছাদন পূর্ব্বক নতবদনে বসিয়া আছে। এ শোকাবহ দৃশ্য যেন তাহার হৃদয়ে আর সহ্য হইতেছে না।

চৌধুরী মহাশয় কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া কহিলেন, "আমার বিছানার মাথার বালিসের নীচে, দুইটী পিতলের চাবি আছে, দেখিতে পাইবে। এখান হইতে বাড়ী ফিরিয়াই সর্ব্বাগ্রে সে দুইটী নিজের নিকট রাখিবে। আমার শয়নকক্ষের পার্শ্বের কক্ষটী, উহার মধ্যে একটী চাবিতে খোলা যায়। অপর চাবিটী ঐ ঘরের মধ্যস্থ ভিত্তিগাত্রে সংলগ্ন অপেক্ষাকৃত একটী বড় আলমারির চাবি। বয়োপ্রাপ্ত হইলে, তুমি অবশ্য বিবাহ করিবে। বিবাহ করিয়া বাড়ী আসিয়া, তুমি তোমার নবপরিণীতা পত্নীর সহিত ঐ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিবে এবং আলমারি খুলিয়া তাহার মধ্যে যে সকল কাগজপত্র দেখিতে পাইবে, মনোযোগের সহিত পাঠ করিবে। তোমার বংশের কোন নিগূঢ় রহস্য তন্মধ্যে নিহিত আছে। কিন্তু সাবধান, বিবাহের পূর্ব্বে কদাপি সে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিবে না। আর যদি তুমি আজীবন অবিবাহিত থাক, তোমার সে কক্ষে প্রবেশ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। তোমার জীবনাবসানের পর—যিনি এই প্রাসাদাধিকারী হইবেন—কোন উপায়ে এই গুপ্ত বিষয় তাঁহার জ্ঞানগোচর হইবে ভাবিয়া, তোমার উদ্বিগ্ন হইবার প্রয়োজন দেখি না। যমুনা যেন এ সম্বন্ধে কোন বিষয় জানিতে না পারে। তুমি ইঙ্গিতে বা লিপিবদ্ধ করিয়া এ সকল কথা কখন তাহাকে জানাইবে না। যদি আমার আদেশের অন্যথাচরণ কর, আমার মৃত্যুকালের আশীর্ব্বাদ তোমার নিকট দারুণ অভিশাপে পরিণত হইবে।"

রোরুদ্যমান যুবক এতক্ষণ অনিমেষনয়নে পিতার মুখের দিকে চাহিয়া, তাঁহার অদ্ভুত প্রত্যাদেশ শুনিতেছিলেন। এক্ষণে ধীরে ধীরে কহিলেন, "পিতঃ! যদি কেহ আমাকে সমগ্র ধরণীর আধিপত্য প্রদান করে, তথাপি আমি আপনার আদেশের অন্যথাচরণ করিব না।"

হরিগোবিন্দ চৌধুরী ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। জোরে জোরে শ্বাস প্রশ্বাস বহিতে লাগিল। তিনি মুখব্যাদন করিলেন। অজয় পিতার মুখে পুনরায় গঙ্গাবারি বিন্দু বিন্দু দিলেন। কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া চৌধুরী মহাশয় পুনরায় কহিলেন, "আমার সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি তোমার হস্তেই সমর্পণ করিয়া চলিলাম। যমুনা যে, আর কখন এই শোচনীয় রোগ হইতে মুক্ত হইতে পারিবে, এরূপ আশা করা যায় না। সে আমরণ তোমার দয়ার প্রত্যাশী হইয়া থাকিবে। যদি কখন এ দুর্দ্দৈব হইতে উদ্ধার পায়, তাহা হইলে দানপত্রের বিশেষ সর্ত্তানুসারে তাহার উপযুক্ত বৃত্তির বিষয় বিবেচনা করিবে।"

অজয়কুমার পিতার আদেশ পালন করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। চৌধুরী মহাশয় নীরব নিস্পন্দ পড়িয়া রহিলেন। চক্ষু মুদ্রিত হইয়া আসিল। নিরঞ্জন বাবু হাত দেখিয়া মাথা নাড়িলেন। চৌধুরী মহাশয়ের আসন্নকাল সমুপস্থিত।

তপন পশ্চিম সাগরে ডুবিয়া গিয়াছেন। ঘনান্ধকারময়ী রাত্রি তারাফুলে কবরী বাঁধিয়া দেখা দিল। নৈশ সমীর গঙ্গাম্বুকণা বহিয়া শ্মশানস্থ জনগণের উদ্বেগখিন্ন মুখমণ্ডলে আসিয়া লাগিতে লাগিল। সকলে উৎকণ্ঠিতচিত্তে সেই ভয়ঙ্কর মুহূর্ত্তের প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলেন।

রাত্রি আট ঘটিকার সময় হরগোবিন্দ চৌধুরীর দেহ হইতে প্রাণবায়ু অনন্তবায়ুরাশির মধ্যে মিশিয়া গেল। অজয়কুমার এবং আত্মীয় স্বজন কাঁদিয়া উঠিলেন। তাঁহাদের করুণ ক্রন্দনধ্বনি কতক নৈশবাতাসে, কতক অবিশ্রান্তগতি ভাগীরথীর কুলকুল ধ্বনির সহিত মিশিয়া যাইতে লাগিল।

অজয়কুমার প্রিয় ভগিনীর হস্তধারণ করিয়া, কাতরকণ্ঠে কহিলেন, "দিদি! আজ আমরা পিতৃহারা হইলাম।" আহা! অভাগিনী বিধবা যুবতীর কর্ণে সে করুণ ধ্বনি প্রবেশ করিল কি না জানি না। যমুনা কিন্তু নীরব—শান্ত—নয়নপ্রান্তে এক বিন্দু অশ্রুও দেখা গেল না। পুনরায় অজয় অঙ্গুলিসঙ্কেতে উপরত পিতাকে নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন, "দিদি! সংসারে আজ আমরা সহায়হীন হইলাম—আজ আমরা পিতৃস্নেহের সুশীতল ছায়া হইতে বঞ্চিত হইলাম।" দর দর ধারে তপ্ত অশ্রু-প্রবাহ যুবকের বক্ষ প্লাবিত করিয়া বহিতে লাগিল। স্নেহময়ী ভগিনী বসনাঞ্চলে স্নেহময় ভ্রাতার নয়নাশ্রু মার্জ্জনা করিয়া, তাঁহাকে বাহুপাশে বেষ্টন করিয়া ধরিল, তাহার পর অনন্ত নীলমাকাশের দিকে ক্ষুদ্র করপল্লব প্রসারিত করিয়া ধরিল। যেন নীরব ভাষায় কহিল, "ভয় কি অজয়! মাতার মৃত্যুর পর হইতে যে ভগ্নী তোমাকে সংসারের অত্যাচার, পিতার উৎপীড়ন হইতে রক্ষা করিয়া আসিতেছে, আজিও সেই তোমাকে রক্ষা করিবে—সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণা উৎপীড়ন, নিঃস্বার্থ ভ্রাতৃস্নেহের অগাধসলিলে ডুবাইয়া দিবে।" তাহার পর উর্দ্ধে হস্তোত্তোলন করিয়া বোধ হয় কহিলেন, "যে অনাদি অনন্ত পরমেশ্বর দুর্ব্বলকে সবলের আক্রমণ হইতে রক্ষা করেন, যিনি নিরাশ্রয়ের আশ্রয়দাতা,

বিপন্নের চিরসুহৃদ—তাঁহারই অনন্ত অযাচিত করুণারাশি তোমাকে সঞ্জীবিত রাখিবে।"

যমুনার নীরব ইঙ্গিতে অজয়ের হৃদয়ে বলের সঞ্চার হইল। তিনি উপরত পিতার প্রেতকার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। যমুনা নিরঞ্জনবাবুর দিকে একবার দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া কি ইঙ্গিত করিলেন, তাহার পর একজন পরিচারিকার সহিত প্রাসাদাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

কয়েকজনে ধরাধরি করিয়া চৌধুরী মহাশয়কে পূত গঙ্গাজলে স্নান করাইয়া আনিলেন। সুগন্ধি চন্দনকাষ্ঠে চিতা সজ্জিত করিয়া—তাহাতে ঘৃত ঢালিয়া দেওয়া হইল। সর্ব্বভুক অগ্নিস্পর্শে চিতা জ্বলিয়া উঠিল। শতমুখী অনলশিখার দীপ্তালোকে গঙ্গাকুলশায়ী শ্মশানভূমি আলোকিত হইয়া উঠিল। সে সময়ে সমবেত জনমণ্ডলীর হৃদয়ভাব নির্দ্ধারণ করা মানবলেখনীর ক্ষমতাতীত। সে সময়ে মানবমাত্রেরই—যত বড় পাষণ্ড পাপী হউক না কেন,—ক্ষণেকের জন্যও তাহার হৃদয়ে এক প্রকার অননুভূত ভাবের সঞ্চার হয়—মুহূর্ত্তের জন্য তাহার অন্তরাত্মা কোন অদৃশ্য অচিন্ত্য অনন্তপুরুষের কার্য্যকলাপের তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়—মুহূর্ত্তের জন্য তাহার মনভ্রমর সেই অনাদি অনন্ত পুরুষের পদপঙ্কজের মকরন্দ পান করিতে উধাও হইয়া যায়। সংসারের আসক্তিতে বিতৃষ্ণা আসে—জগতের নশ্বরতার জ্বলন্ত চিত্র মনশ্চক্ষের সম্মুখে কে যেন ধরিয়া দাঁড়ায়। মানবজীবনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার আয়াসলব্ধ, কষ্টোপার্জ্জিত ধনরত্নেরও যে সম্বন্ধ ফুরায়—যাহাদের মায়ায় আবদ্ধ হইয়া, যাহাদের সুখশান্তির পথ মুক্ত করিতে মানব অক্ষালনীয় পাপপঙ্কে হৃদয়কে ডুবাইতেও কুণ্ঠিত হয় না,

সেই আত্মীয়স্বজনের সহিতও সকল সম্বন্ধের শেষ হয়—সে বিষয়েও যেন মুহূর্ত্তের জন্য উপলব্ধি জন্মে। কিন্তু সে কতক্ষণের জন্য ?

রোরুদ্যমান অজয় আত্মীয়গণের সাহায্যে পিতার গতায়ু দেহ প্রজ্জ্বলিত চিতাশয্যায় শায়িত করিতে উদ্যত হইলেন। এই সময়ে এক রমণী ঊর্দ্ধশ্বাসে শ্মশানে ছুটিয়া আসিল। রমণীর মর্ম্ম-ভেদী চীৎকারে শ্মশানভূমি প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। অপরিচিতা আর্ত্তনাদ করিয়া হরগোবিন্দ চৌধুরীর মৃতদেহের উপর পতিত হইল। তাহার করুণবিলাপে সমবেত লোক সকলের চক্ষে জল আসিল। অজয়কুমার মুহূর্ত্তের জন্য স্তম্ভিত, কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়। এ রমণী কে ?

তিনি প্রকৃতিস্থ হইয়া, রমণীকে পিতার বক্ষোপরি হইতে উত্তোলন পূর্ব্বক, ধীর শান্তস্বরে কহিলেন, "তোমায় আমি চিনি না—তুমি কে ? কি নিমিত্ত এরূপভাবে আমাদের কার্য্যে ব্যাঘাত দিতেছ ?"

রমণী কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "আমি কে ? কি বলিয়া পরিচয় দিব জানি না !"

অজয়।—আমি তোমায় পূর্ব্বে কখন দেখি নাই। তোমার ভাবে বোধ হইতেছে, তুমি আমার পিতাকে চেন !

রমণী।—চিনি—ভাল রকমই চিনি ! আপনিই কি হরগোবিন্দ বাবুর পুত্র অজয়কুমার ?

অজয়।—তোমার অনুমান মিথ্যা নয়।

রমণী।—তাহা হইলে অজয় ! আজি তুমি যাঁহার অভাবে পিতৃহারা হইলে, আমিও তাঁহার মৃত্যুতে আজি পথের ভিখারিণী হইলাম।

রমণী পুনরায় আর্ত্তনাদ করিয়া শবদেহের উপর পতিত হইল। অজয় তাহাকে পুনরায় ধরিয়া তুলিলেন। রমণীর তখন সংজ্ঞা লুপ্ত হইয়াছে। অজয় তাহাকে কোলে করিয়া বালুকারাশির উপর উপবেশন করিলেন। নিরঞ্জনবাবু কামিনীর চৈতন্য সম্পাদনে ব্যস্ত হইলেন।

রমণীর বয়ঃক্রম বিংশ বর্ষের অধিক হইবে না। তাহার সুন্দর মুখশ্রী—উজ্জ্বল দীপ্ত গৌরকান্তি দেখিয়া তাহাকে কোন নীচবংশোদ্ভবা বলিয়া কাহারও ধারণা জন্মে না। পরিধানে উৎকৃষ্ট বসন—দেহে বহুমূল্যের হীরকাদিখচিত অলঙ্কার। যুবতী অজ্ঞানাবস্থায় শৈলপুরের নবজমিদারের অঙ্কে শায়িত। প্রজ্জলিত চিতালোক কাঁপিয়া কাঁপিয়া রমণীর মুখমণ্ডলে, অসংবদ্ধ কেশ-রাশিতে এবং শিথিলবসন পীবরবক্ষে পতিত হইতেছিল। সুন্দর আকর্ণ বিস্তৃত চক্ষু দুইটী নিমীলিত। নিরঞ্জনবাবু চোখে মুখে জলসেক করিতে লাগিলেন।

অনেকক্ষণ পরে যুবতীর চেতনা সঞ্চার হইল। ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল এবং পুনরায় কাতরকণ্ঠে কহিল, "প্রিয়তম! তুমি কোথায়?"

"এও কি সম্ভব!" বলিয়া একজন দর্শক চীৎকার করিয়া উঠিল এবং সেই ক্ষুদ্র জনতার মধ্য দিয়া ঘটনাস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি এতক্ষণ কিঞ্চিৎ দূরে দাড়াইয়া এই শোকাবহ দৃশ্য দর্শন করিতেছিলেন। তাঁহার বয়ঃক্রম অনুমান পঞ্চবিংশতি বৎসর। আকৃতি দীর্ঘ—মুখকান্তি সুন্দর। বর্ণ তপ্তকাঞ্চনপ্রভ। চক্ষু বিস্তৃত, নীলোৎপল সদৃশ মনোজ্ঞ।

যুবক অপেক্ষাকৃত নিকটবর্ত্তী হইয়া যুবতীর মুখের দিকে একবার

তীক্ষ্ণদৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া সানন্দে বলিয়া উঠিলেন, "কখনও আমার ভ্রম নয়—অসম্ভব—এই না সেই অলকা!"

যুবতী ভয়ে বিস্ময়ে বিহ্বলা হইয়া, তাহার নামোচ্চারণকারীর প্রতি দৃষ্টি সঞ্চালন করিল। যুবক অগ্রবর্ত্তী হইয়া, যুবতীকে ভুজপাশে আবদ্ধ করিয়া কহিলেন, "অলকা—অলকা! তুমি!"

রমণী কিন্তু চীৎকার পূর্ব্বক যুবকের আলিঙ্গন হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিবার প্রয়াস পাইতে লাগিল।

যুবক সস্নেহে কহিল, "অভাগিনী, আমায় কি ভুলিয়াছিস্। আমায় কি চিনিতে পারিতেছিস্ না?"

যুবতী যুবকের মুখের দিকে চাহিয়া ভয়ে চীৎকার করিয়া পুনরায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

অজয়কুমার অগ্রবর্ত্তী হইয়া কহিলেন, "মহাশয়! এ রমণী কে? আপনার কি ইনি পরিচিতা।"

যুবক উদ্ধতস্বরে কহিলেন, "এখন পরিচয় দিবার সময় নয়—সময়ে সমস্ত জানিতে পারিবেন।"

অজয় বিনীতভাবে কহিলেন, "মহাশয়! ক্ষমা করিবেন। আমি যতদূর বুঝিয়াছি, তাহাতে আমার ধারণা জন্মিয়াছে, রমণী আমার পিতার অনুগ্রহপাত্রী। যদি আমার অনুমান সত্য হয়—এরূপ ঘটনায় যেরূপ করা কর্ত্তব্য আমি সে বিষয়ে সাধ্যমত চেষ্টা করিব।"

অপরিচিত যুবক অজয়ের মুখের দিকে রুক্ষদৃষ্টি বিক্ষেপ করিয়া, কর্কশস্বরে কহিলেন, "চেষ্টায় এখন আর কোন ফল নাই—আপনার পিতাই ইহার অধঃপতনের মূল। যাহা হউক, আপনাকে এ সময়ে সন্তপ্ত করিতে ইচ্ছা করি না—কাল সন্ধ্যার

সময় আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব।" এই বলিয়া যুবক হীনসংজ্ঞা যুবতীকে স্কন্ধে লইয়া শ্মশানভূমি হইতে তাঁহার বাসস্থানাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ পরস্পর দৃষ্টিবিনিময় করিল। অজয়কুমারও একবার ডাক্তারবাবুর মুখের দিকে চাহিলেন। তাহার পর সকলে মিলিয়া চৌধুরী মহাশয়ের শবদেহ চিতার উপর তুলিয়া দিল। দেখিতে দেখিতে ভৌতিক দেহ পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল।

ঊর্দ্ধে অনন্তবিস্তৃত অনন্তাকাশে অনন্ত নক্ষত্র। নীচে বায়ুচঞ্চল গঙ্গাবক্ষে—ক্ষুদ্র বৃহৎ অগণ্য তরঙ্গ'পরে অনন্ত নক্ষত্রের বিকাশ। কেহ যেন নক্ষত্রমালা ছিন্ন করিয়া গঙ্গাজলে ভাসাইয়া দিয়াছে। তটে শ্মশানভূমিতে জ্বলন্ত চিতাশয্যায় মানবের যত্নপুষ্ট দেহ পুড়িতেছে। যে দেহে অনলকণা স্পর্শ করিলেও অসহ্য জ্বালা সমুৎপন্ন হইত—সেই দেহ—পুড়িয়া ছাই হইতেছে। হায় মানব! কোথায় তোমার সেই দেহ, আর কোথায় তুমি! কায়ে প্রাণে যেখানে এই সম্বন্ধ—সেখানে এত বাড়াবাড়ি কেন? দুদিনের তরে সংসারে আসিয়া বৃথা ধনগর্ব্বে কেন আত্মহারা হও, রূপমদে আত্মবিস্মৃত হইয়া কেন সংসারে অশান্তির কোলাহল উত্থাপিত কর?

অজয় চিতা ধৌত করিয়া, পিতার অক্ষয় স্বর্গকামনায় পিতৃ-অস্থি জাহ্নবীজলে নিক্ষেপ করিলেন, তাহার পর স্নানাদি সমাপন পূর্ব্বক মানবজীবনের নশ্বরতা—রূপযৌবন, ধনসম্পত্তির ভঙ্গুরতা ভাবিতে ভাবিতে প্রাসাদাভিমুখে ফিরিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ভাই ভগ্নী।

আমরা আমাদের এই বর্ত্তমান আখ্যায়িকার অপরাপর বিষয় বর্ণন করিবার পূর্ব্বে, পাঠক-পাঠিকাকে হরগোবিন্দ চৌধুরীর সাংসারিক কতকগুলি বিষয় বলিয়া রাখিব।

চৌধুরী মহাশয়ের এক পুত্র এবং এক কন্যা। কন্যা জ্যেষ্ঠা, পুত্রটী কনিষ্ঠ। যমুনার বয়ঃক্রম যখন ত্রয়োদশ বৎসর, তখন কোন অনৈসর্গিক কারণে অকস্মাৎ তাঁহার জননীর মৃত্যু হয়। মাতার মৃত্যুশোক তাহার এতদূর অসহ্য হইয়াছিল যে, কয়েক মাস তাহাকে শয্যাশায়িনী থাকিতে হইয়াছিল। ডাক্তার নিরঞ্জনবাবু তাহার চিকিৎসা করেন। যখন যমুনার রোগোপশম হইবার উপক্রম হইল, তখন ডাক্তারবাবু একদিন চৌধুরী মহাশয়কে কহিলেন, "মহাশয়! অনেক কষ্টে আপনার কন্যা এ যাত্রা জীবন পাইল সত্য কিন্তু তাহার দুইটী প্রধান অঙ্গহানি হইবে। যমুনা বোবা এবং কালা হইবে।"

চৌধুরী মহাশয় প্রিয়তমা কন্যার চিকিৎসায় বহু অর্থব্যয় করিলেন, কিন্তু সকলই বৃথা হইল।

হতভাগিনী মূক বধির বালিকার বয়োবৃদ্ধি সহকারে তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে লাগিল। যৌবন-

সমাগমে চারু দেহলতিকা অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। সুন্দর মুখমণ্ডলে সুবিশাল কৃষ্ণতার নীলোজ্জ্বল নয়নের শোভাই এক অপূর্ব্ব জিনিষ। তাহাদের সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি মর্ম্মস্থল পর্য্যন্ত ভেদ করিতে সমর্থ। নাসিকা সুন্দর এবং উন্নত। ক্ষুদ্র, লোহিতরাগরঞ্জিত এবং রসপুষ্ট ওষ্ঠ ঈষৎ বর্ত্তুলাকারে অধরের উপর স্থাপিত। সুন্দর গোলাকার অধর নিম্নভাগ দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা এবং ইন্দ্রিয়সুখাভিলাষিতার সম্পূর্ণ পরিচায়ক। উজ্জ্বলজ্যোতিঃ-পূর্ণ নয়নের তীব্রকটাক্ষের নিকট কোন কামাচারীর বক্রদৃষ্টি তিষ্ঠিতে পারিত না। তাহাকে দেখিবামাত্র দর্শকের মনে ভয়বিস্ময় এবং সুখ্যাতির উদ্রেক হইত।

হরগোবিন্দ চৌধুরী দাম্ভিকপ্রকৃতির লোক ছিলেন। যমুনার স্বভাবও পিতার সম্পূর্ণ অনুরূপ হইয়াছিল। কন্যাতে স্বীয় স্বভাবের ছায়া দর্শন করিয়া, চৌধুরী মহাশয় কন্যাকে অধিক পরিমাণে স্নেহ করিতেন। তিনি যমুনাকে যে পরিমাণে স্নেহ করিতেন, পুত্র অজয়কে সেই পরিমাণে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। অজয়ের স্বভাব সুকোমল—তিনি মিষ্টভাষী, লোকরঞ্জক এবং সদাশয়। তাঁহার সুকুমার মুখ-মণ্ডলে সর্ব্বদা সততা, সরলতা এবং অমায়িকতা খেলা করিয়া বেড়াইত। তিনি ভৃত্যবর্গ এবং অধীন প্রজাবর্গের উপর সদয় ব্যবহার করিতেন—এই সকল কারণে তাঁহার পিতা তাঁহার উপর আরও বিরক্ত।

অজয়ের প্রতি যমুনার ব্যবহার কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত। যমুনা অন্যের উপর যতই দুর্ব্ব্যবহার করুন না কেন, তাঁহার স্বভাব যতই উদ্ধত এবং দাম্ভিকতায় পূর্ণ হউক না কেন,

ভ্রাতার সহিত ব্যবহারে সর্ব্বথা তাহা কোমল এবং কমনীয়। পিতা অজয়কে যে পরিমাণে ঘৃণা করিতেন, ভগ্নী ভ্রাতাকে সেই পরিমাণে স্নেহ করিতেন। অজয়ের উপর হরগোবিন্দের ব্যবহার দিনে দিনে যেমন উগ্র এবং অত্যাচারপূর্ণ হইতে লাগিল, তাহার প্রতি যমুনার অনুরাগের সেই পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

যমুনার ভ্রাতৃস্নেহ অপার। সে স্নেহে স্বার্থ নাই, কপটতা নাই—সংসারের আবিলতা নাই—সে স্নেহ স্বাভাবিক, স্বচ্ছ, পবিত্র। ভগ্নী ভ্রাতাকে যতদূর ভালবাসিতে পারে, অজয়ের প্রতি যমুনার ভালবাসায় তাহার চরমোৎকর্ষ লক্ষিত হয়। যমুনা মূক এবং বধির হইলেও, কনিষ্ঠ ভ্রাতার নিকট স্নেহে মাতা—প্রণয়ে পত্নী—অনুরাগে সঙ্গিনী। অল্পবয়সে মাতৃস্নেহে বঞ্চিত হইলেও, অজয়কে এক দিনের জন্যও মাতার অভাব অনুভব করিতে হয় নাই। যমুনার জীবন যেন অজয়ের সুখস্বচ্ছন্দতা সম্পাদনের জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে। অজয় কিসে সুখে থাকিবে—কিসে তাহার মন প্রফুল্লিত হইবে—কিসে সে পিতার অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবে—অহর্নিশ এই তাহার ভাবনা। নিজের জীবন উপেক্ষা করিয়া—আত্মজীবনকে বিপন্ন করিয়া, যমুনা মূর্ত্তিমতী দয়ার ন্যায় নীরবে সহোদরের সেবা করিতেন।

বাড়ীর ভৃত্যবর্গ এবং অধীন কর্ম্মচারী মূক-বধির যমুনার দাপে সর্ব্বদা সশঙ্ক। কেহ কোনরূপে তাহার বিরক্তির কারণ হইলে, তাহার আর নিস্তার থাকিত না। তাহার নীরব ভর্ৎসনায় সে অন্তরে কম্পিত হইত। যমুনার অস্বাভাবিক

তেজোপূর্ণ, নীলোজ্জ্বল দীপ্তিবিভাসিত নয়নদ্বয় হইতে বিদ্যুৎবহ্নি প্রস্ফুরিত হইত এবং অধরোষ্ঠ দারুণ কোপপ্রযুক্ত কম্পিত হইত। তাঁহার পিতাও কোনরূপে তাঁহার বিরক্তির কারণ হইলে, তাঁহারও নিস্তার ছিল না। হরগোবিন্দ যদি কখনও যমুনার সম্মুখে অজয়কে ভৎর্সনা করিতেন, তাহা হইলে যমুনা প্রথমতঃ পিতার দিকে কোপকষায়িত তীব্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেন, তাহাতে কোন ফল না দর্শিলে, অভিমানে যমুনার নীলনয়ন ফাটিয়া জলধারা গণ্ড বহিয়া পড়িতে থাকিত। যমুনার চক্ষের জল হরগোবিন্দের অসহ্য—সুতরাং তিনি অজয়কে আর কোন কথা বলিতে সাহস করিতেন না।

এই শোচনীয় দশা ঘটিবার পূর্ব্বে যমুনা বেশ লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। আকার ইঙ্গিতে, অথবা মানসিক-ভাব লিপিবদ্ধ করিয়া, যমুনা সহোদরের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেন। যমুনা ডাক্তার নিরঞ্জন বাবুকে পিতার ন্যায় ভক্তি করিতেন। ডাক্তারও তাঁহাকে স্বীয় কন্যার মত স্নেহ করিতেন। প্রায়ই নিরঞ্জনবাবুর বাড়ীতে যমুনার যাতায়াত ছিল।

চৌধুরী মহাশয়ের সংসারে দুই একটা দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় কুটুম্ব ভিন্ন অন্য পরিবার ছিল না।

যমুনা অবিবাহিতা। হরগোবিন্দ কন্যার বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। যমুনা তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করায়, সে বিষয়ের আর কোন উত্থাপন হয় নাই। যমুনা চিরকুমারী থাকিয়া, ভ্রাতৃসেবায় জীবন উৎসর্গ করিতে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন।
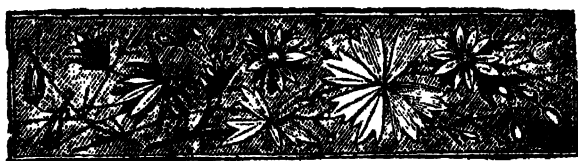
তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

যমুনা ও সরসী।

যমুনা বাটী ফিরিয়াই নিজ কক্ষে প্রবেশ করিলেন। কক্ষমধ্যে একটী সুন্দরী জাজিমের উপর বসিয়াছিল, যমুনাকে দেখিবামাত্র উঠিয়া দাঁড়াইল এবং তাঁহার মুখের দিকে জিজ্ঞাসাসূচকদৃষ্টি সঞ্চালন করিল। যমুনা ইঙ্গিত করিয়া কহিলেন, "সব ফুরাইয়াছে!"

কিশোরীর অন্তর কাঁপিয়া উঠিল—চক্ষে জলধারা ঝরিল। কিন্তু যমুনার চক্ষে একবিন্দুও অশ্রু নাই দেখিয়া, তাহার বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। যমুনা তাহাকে গৃহ হইতে চলিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিলেন; সে দ্বিরুক্তি না করিয়া প্রস্থান করিল।

এই কিশোরীর নাম সরসীবালা, জাতিতে ব্রাহ্মণ। এক সময়ে তাহাদের অবস্থাও ভাল ছিল, কালের কুটিলগতিতে এখন সব গিয়াছে। পিতা মাতা, আত্মীয়স্বজন, ধন সম্পত্তি সকলই প্রখর কালস্রোতে অনন্তে ভাসিয়া গিয়াছে। সংসারে তাহার এক সহোদর এবং এক পিসী বর্ত্তমান আছে। সহোদরের বয়স বিংশবর্ষ, বিদেশে কার্য্য করে; পিসী শৈলপুরেই থাকে। তাহার অবস্থাও অতি শোচনীয়।

সরসী পরমসুন্দরী। তাহার নীলাভনয়ন-পদ্মের স্নিগ্ধ-জ্যোতিঃ যাহার উপর একবার পতিত হয়—তাহার অন্তর মধ্যে আপনা হইতে এক প্রকার আনন্দস্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে। মুখখানি সুন্দর—চক্ষু দুইটী সুন্দর—প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সুন্দর—সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর তাহার স্বভাব। দেহ-খানি ঈষৎ দীর্ঘ—নাতিস্থূল, সুন্দর গ্রীবা সৌন্দর্য্যভরে ঈষৎ বঙ্কিম। গুচ্ছে গুচ্ছে কুণ্ডলি পাকাইয়া, ভ্রমরকৃষ্ণ কেশরাশি নিতম্ব ছাড়াইয়া, প্রায়ই গুল্‌ফ পর্য্যন্ত লম্বিত থাকে। চূর্ণালক সুন্দর অপ্রশস্ত ললাটফলকে ঝালরের ন্যায় ঝুলিতে থাকে—তাহাতে সুন্দর মুখের রমণীয়তা আরও বৃদ্ধি পায়।

সরসী দুর্দ্দশায় পড়িয়া হরগোবিন্দ চৌধুরীর বাড়ীতে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে। সে যমুনার দাসী বা সহচরী।

সরসী চলিয়া যাইবামাত্র যমুনা কক্ষদ্বার রুদ্ধ করিয়া, শয্যার উপর শুইয়া পড়িলেন। উভয়করে মুখাচ্ছাদন পূর্ব্বক ক্ষুদ্র বালিকার ন্যায় যমুনা কাঁদিতে লাগিল। অনেকক্ষণ ধরিয়া আপন মনে অভাগিনী কাঁদিল। তাহার অশ্রুজলে শয্যাতল সিক্ত হইয়া উঠিল। বহুক্ষণ নীরব রোদনে, তাহার হৃদয়ের গুরুভারের অনেকটা লাঘব হইল। যমুনা শয্যার উপর উঠিয়া বসিল। ভিত্তিগাত্রে বিলম্বিত একখানি আলেখ্যের উপর দৃষ্টি পড়িবামাত্র তাহার ভাবের পরিবর্ত্তন ঘটিল। ছবিখানি তাঁহার মৃত মাতা অনঙ্গকুমারীর।

যমুনা বহুক্ষণ মাতার প্রশান্ত বদনের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। তাহার বিশ্রান্ত নয়নযুগল হইতে দরবিগলিত ধারা ঝরিতে লাগিল। মাতার মুখের দিকে চাহিতে

চাহিতে তাঁহার মুখভাবের পরিবর্ত্তন ঘটিল—নয়নজ্যোতিঃ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল—ওষ্ঠাধর দৃঢ় সংবদ্ধ হইল—দক্ষিণহস্ত মুষ্টিবদ্ধ হইল। যমুনা উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ধীরহস্তে কক্ষদ্বার উন্মুক্ত করিয়া, যমুনা একবার বাহিরের দিকে দৃষ্টি সঞ্চালিত করিলেন। বাটী নিস্তব্ধ—এখনও সৎকার করিয়া কেহ ফিরে নাই। বাটীর ভৃত্যাদি আপন আপন কক্ষে অবস্থান করিতেছে। যমুনা একটী আলোকহস্তে ধীর, সতর্ক পদে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তাঁহার চোখে মুখে অধরে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞতার একটা ছায়া সুস্পষ্ট প্রতিভাত হইতে লাগিল।

যমুনা তাঁহার পিতার কক্ষে প্রবেশ করিয়া, তাঁহার শয্যাস্থিত উপাধানের নিম্নভাগ হইতে দুইটী পিতলের চাবি বাহির করিয়া লইলেন এবং দ্বার পূর্ব্ববৎ রুদ্ধ করিয়া, সেই কক্ষের পার্শ্বস্থিত কক্ষটী উক্ত চাবির সাহায্যে মুক্ত করিলেন। তাহার পর কম্পিতহস্তে আলোক ধরিয়া সেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

কক্ষে কোন পদার্থ নাই, কেবল একটী আলমারি। তথায় প্রবেশ করিবামাত্র—কি একটা অনিশ্চিতভয়ে তাঁহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। যমুনা দশনে অধর দংশন করিয়া, একবার ভ্রুকুটী করিল। তাহার পর একহস্তে আলোক ধরিয়া, অপরহস্তের সাহায্যে চাবিটী আলমারিতে লাগাইল। পুনরায় তাহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। তাহার মনে হইতে লাগিল যেন, রহস্যময় এই গুপ্তগৃহের আলমারিমধ্যে কোন বিভীষিকা লুকাইয়া আছে।

যমুনা সাহসে ভর করিয়া, আলমারিটী খুলিবামাত্র ভয়ে

কম্পিত হইয়া, পশ্চাতে দুই তিন পদ হটিয়া আসিল। তাহার মুখবর্ণ বিবর্ণ—বদনভাতি রক্তহীন এবং শ্বেতবর্ণ হইয়া আসিল। আলোকাধার কম্পিতহস্ত হইতে খসিয়া পড়িবার উপক্রম হইল। এই নির্ভীকা, সাহসের প্রত্যক্ষমূর্ত্তি যুবতী মুহূর্ত্তের জন্য আত্মহারা, বিহ্বলা হইল। সঙ্কল্পিত কার্য্য অসম্পূর্ণ রাখিয়া, গৃহ হইতে পলায়ন করিতে মুহূর্ত্তের জন্য তাহার ইচ্ছা হইল। কিন্তু পরক্ষণে তাহার ওষ্ঠাধর লৌহের ন্যায় কঠিন হইয়া, পরস্পরের উপর দৃঢ়-সংবদ্ধ হইল—অক্ষিযুগল হইতে অস্বাভাবিক দীপ্তি নির্গত হইতে লাগিল। যমুনা সাহস সহকারে অগ্রবর্ত্তিনী হইয়া, আলমারির মধ্যস্থ কোন একটী পদার্থ বাহির করিয়া লইল, তাহার পর আলমারি পূর্ব্ববৎ বন্ধ করিয়া, গৃহ হইতে নিক্রান্ত হইল এবং নিঃশব্দে গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া, চাবি দুইটী পূর্ব্বস্থানে রাখিয়া আসিল।

যমুনা আপন কক্ষে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। সম্মুখে আলোক রাখিয়া, কালফিতাবদ্ধ কয়েকখানি কাগজ বাহির করিয়া পড়িতে লাগিল। পত্রের হস্তাক্ষর তাহার পরিচিত।

পত্রমধ্যে নিশ্চয়ই কোন অতি ভয়ঙ্কর বিষয় লিপিবদ্ধ আছে। নতুবা মুহুর্মুহু যমুনার মুখাবয়বের এত পরিবর্ত্তন ঘটিবে কেন? সময়ে সময়ে তাহার ওষ্ঠাধর কম্পিত এবং শ্বাস প্রশ্বাস নিরুদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। মুখকান্তি মলিন, নিষ্প্রভ হইতে লাগিল। কখন বা চক্ষু দিয়া অস্বাভাবিক তেজ স্ফুরিত হইতে লাগিল—অধরোষ্ঠ দ্বিধাকৃত

হইল—দন্তে দন্ত ঘর্ষিত হইল। কখন বা সবেগে হৃদয় স্পন্দিত হইতে লাগিল। যমুনা বিহ্বলা হইয়া বসিয়া রহিল।

অবশেষে পাঠ সমাপ্ত হইলে, তেজস্বিনী মূক বামা দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া, আন্তরিক ক্রোধের সহিত কাগজ কয়খানিকে দূরে নিক্ষেপ করিল। সহসা তাহার দৃষ্টি মাতার হাস্যমাখা প্রশান্ত মুখখানির উপর পতিত হইল। অমনি যেন কোন দৈব মন্ত্রবলে নিমিষের মধ্যে তাহার হৃদয়ের ভাবান্তর ঘটিল। হতভাগিনী মূক যুবতী নতজানু হইয়া, যুক্তকরে মাতার প্রতিকৃতির সম্মুখে বসিল। তাহার গোলাপাভ গণ্ডস্থল বহিয়া মুক্ত স্বচ্ছ অশ্রুবিন্দু পড়িতে লাগিল। অনিমেষনয়নে মাতার শান্তজ্যোতিঃ মুখমণ্ডলের দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে, তাহার শোকোদ্বেলিত, দুঃখভারে নিষ্পেষিত হৃদয় শান্তভাব ধারণ করিল। যুবতী উঠিয়া বসিল। গৃহতলে বিক্ষিপ্ত কাগজগুলি সংগ্রহ করিয়া, আলোক হস্তে পুনরায় গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল এবং কাগজগুলি যথাস্থানে রাখিয়া ফিরিয়া আসিল। ক্ষুদ্রগৃহের দ্বার খুলিয়া, তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পুনরায় তাহার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল—ললাটে স্বেদ দেখা দিল।

প্রত্যূষে সরসী আসিয়া, যমুনার কক্ষদ্বারে করাঘাত করিল। যমুনা উঠিয়া দ্বার খুলিয়া দিল, সরসী গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃত হইল, যমুনা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া একখানি চেয়ারের উপর উপবেশন করিল।

সরসী গৃহ পরিষ্কার করিতে করিতে দেখিতে পাইল, গৃহকোণে একখানি কাগজ পড়িয়া রহিয়াছে। ভাবিল, যমুনার

কোন পত্রাদি। হস্তাক্ষর তাহার নিতান্ত অপরিচিত না হইলেও, কাহার নির্দ্ধারণ করিতে পারিল না। সরসী কাগজখানি তুলিয়া, যমুনাকে দেখাইতে গেল। অনিচ্ছাসত্বেও তাহার নেত্রদৃষ্টি কাগজখানির একাংশে পতিত হইল। পত্রখানি পড়িতে তাহার মনে কোন প্রকার কু-অভিপ্রায় না থাকিলেও, তাহার চিত্তের অধীরতাবশতই হউক অথবা পত্রবর্ণিত বিষয়ের ভীষণতার জন্যই হউক, সরসী পত্রাংশের চারি পংক্তি পড়িয়া ফেলিল। ভয়ে বিস্ময়ে তাহার সর্ব্বশরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল। ধমনীমুখে শোণিতপ্রবাহ নিরুদ্ধ হইয়া আসিল—ললাটে স্বেদ দেখা দিল—কিন্তু মুখ হইতে একটী কথাও বাহির হইল না। যে কয়েক পংক্তি পাঠ করিয়া, তাহার ভাবান্তর ঘটিল, তাহা এইরূপভাবে লেখা ছিল ;—

"ঘাতকের নির্দ্দয় নিশিত ছুরিকা তাহার স্পন্দিত হৃৎপিণ্ডকে নিঃশব্দে খণ্ড খণ্ড করিয়াছে। যখন তাহার বক্ষঃস্থলে ছুরি আমূল বিদ্ধ হইল, উৎসের ন্যায় শোণিতধারা বেগে ছুটিতে লাগিল, তখন উৎকট আনন্দে আমার——"

সরসী আর পড়িল না, ইচ্ছা থাকিলেও আর পারিল না। সত্বর কাগজখানি লইয়া যমুনার সম্মুখে ধরিল। যমুনা অন্যমনস্ক ছিল, কাগজখানির উপর দৃষ্টি পড়িবামাত্র সহসা চমকিয়া উঠিল এবং চেয়ার হইতে বেগে উঠিয়া, লাঙ্গুলাবমৃষ্টা বাঘিনীর ন্যায় গ্রীবা হেলাইয়া, সরসীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। তাহার পর কাগজখানির প্রতি আর একবার দৃষ্টিপাত করিয়া, অঙ্গুলি সঙ্কেতে জিজ্ঞাসা করিল, "এ কোথায় পাইলি ?"

সরসীও সঙ্কেতে কহিল, গৃহকোণে পড়িয়া ছিল। যমুনা পুনরায় ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসিল, "তাহা হইলে, তুই ইহা পড়িয়াছিস্ ?"

যমুনার তীব্র কটাক্ষ তাহার মুখের উপর স্থাপিত হইল। সেই অনলকণবর্ষী তীব্রদীপ্তি দৃষ্টির সম্মুখে সরসী কাঁপিয়া উঠিল। সে মিথ্যা কথাকে ঘৃণা করিত—তাহার প্রত্যুত্তর তাহার কর্ত্রীর নিকট প্রীতিপ্রদ হইবে না, তথাপি অকপটে ইঙ্গিতে কহিল, "প্রথম চারি ছত্র পড়িয়াছি।"

যমুনা সেই চারি ছত্রে কি লেখা আছে একবার পড়িয়া দেখিল, তাহার পর সুন্দর চম্পকাঙ্গুলি সঙ্কেতে জিজ্ঞাসা করিল, "অধিক পড় নাই ?"

সরসী ঊর্দ্ধে দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া নীরব ভাষায় উত্তর করিল, "ঈশ্বরের নামে শপথ করিয়া বলিতেছি, অধিক পড়ি নাই।"

যমুনা তাহার অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত লক্ষ্য করিবার মানসে তাহার সরলতা মাখান সুন্দর মুখপ্রতি আর একবার তাহার বিদ্যুদ্দামস্ফুরিত দৃষ্টি সঞ্চালন করিল। সরসীর মুখে প্রবঞ্চনা বা কপটতার কোন নিদর্শনই দেখিতে পাইল না। তাহার উগ্রভাব কতকটা প্রশমিত হইল। পূর্ব্ববৎ ইঙ্গিতে কহিল, "আমি তোমায় বিশ্বাস করি—কিন্তু সাবধান, ইহার বিন্দু-বিসর্গ কোন জীবিত প্রাণীর সম্মুখে ব্যক্ত করিও না।"

সরসী স্বীকার করিল, যমুনা কাগজখানি তাহার বাক্স-মধ্যে রক্ষা করিয়া, স্নানার্থ প্রস্থান করিল।

কোন কার্য্যে সামান্য ত্রুটী হইলেও, সরসীকে যমুনার

নিকট এইরূপে তাড়না সহ্য করিতে হইত। হতভাগিনী, পিতৃ-মাতৃহীনা সরলা বালিকা নীরবে সকলই সহ্য করিত। নীরবে অশ্রুজল মুছিত, কাহাকে কোন কথা বলিত না। অজয়ের সুন্দরমূর্ত্তি স্মরণ করিয়া, নীরবে গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃত হইত।

রাত্রে যমুনা আর একটী দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল। সকলে সুষুপ্ত হইলে, নিঃশব্দে আপন কক্ষ হইতে নিস্ক্রান্ত হইয়া, সহোদরের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল এবং ধীরহস্তে তাঁহার অঙ্গবস্ত্র হইতে দুইটী চাবি খুলিয়া লইয়া সেই অপূর্ব্ব রহস্যময় ক্ষুদ্রগৃহে প্রবেশ করিল। গৃহমধ্যে কি আছে জানি না কিন্তু তাহাতে প্রবেশ করিতে যমুনার ন্যায় সাহসিকা রমণীরও হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠিল। যমুনা সত্বর আলমারি খুলিয়া, তাহার মধ্যে কি একটী পদার্থ রাখিল এবং গৃহদ্বার পূর্ব্ববৎ রুদ্ধ করিয়া, চাবি দুইটী অজয়ের অঙ্গবস্ত্রের যথাস্থানে স্থাপনপূর্ব্বক স্বীয় কক্ষে আসিয়া শয়ন করিল।

তাহার দোষ কি—আমি না মরিলে—তাহার সাধ্য কি আমায় বিপথগামিনী করে।"

ব্রজেন্দ্র দেখিলেন, অলকা কুলত্যাগ করিয়া অনুতপ্ত হইলেও, হরগোবিন্দের প্রতি তাহার ভালবাসা অগাধ। তিনি সে সম্বন্ধে আর কোন কথা তুলিলেন না।

অলকা গৃহের বহুমূল্যের আসবাব পত্রের প্রতি লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা. এ বাড়ী কাহার? তুমি এখানে কবে আসিলে?"

ব্রজেন্দ্র। আমি দুইমাস এখানে আসিয়াছি। এ বাটী, এ সমস্ত বিভব আমারই।

অলকা বিস্ময়ে ভ্রাতৃমুখপানে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, "তোমার?"

ব্রজেন্দ্র। আমারই সমস্ত।

অলকা বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে ব্রজেন্দ্রের মুখপানে চাহিয়া রহিল। ব্রজেন্দ্র মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "এ গরীব ব্রাহ্মণ কোথায় পাইল শুনিবে? বলিতেছি।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্বকথা।

দরিদ্র ব্রাহ্মণকুমার ব্রজেন্দ্র কিরূপে এত বিষয়সম্পত্তির অধিকারী হইল, সে বিষয় বলিবার পূর্ব্বে আমরা তাঁহার একটু পূর্ব্বপরিচয় দিয়া রাখি।

হরিবল্লভপুরে এক নিঃস্ব ব্রাহ্মণ-পরিবার বাস করিত। হরগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংসারে তাঁহার স্ত্রী, একটী পুত্র এবং একটী কন্যা। জমিদারের বাড়ীতে গোমস্তাগিরি করিয়া কোনরূপে সংসার চালাইতেন। পুত্রের বয়স যখন সপ্তদশ এবং কন্যার বয়ঃক্রম পঞ্চদশ, তখন বিসূচীকা রোগে ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণী ইহলোক হইতে অপসৃত হন। সপ্তদশ বর্ষের সংসারানভিজ্ঞ যুবক ব্রজেন্দ্র, ভগ্নী অলকাকে লইয়া সংসারের অকূলপাথারে ভাসিলেন। অর্থাভাবে হরগোপাল এতদিন কন্যাটিকে পাত্রস্থ করিতে পারেন নাই—ব্রজেন্দ্রও যে এখন কোনরূপে ভগ্নীর বিবাহ দিতে পারিবেন, সে আশা অতি অল্প।

অতিকষ্টে ব্রজেন্দ্র এবং অলকার দিন-গুজরাণ হইতে লাগিল। সুখে দুঃখে দুই বৎসর কাটিয়া গেল। দুই ভাই

ভগ্নীতে ভগ্নকুটীরের বহির্ভাগে নীলাকাশের নিম্নে বসিয়া, কত দিন পিতামাতার শোকে অধীর হইয়া কাটাইয়া দিলেন। কত দিন অনশনে দুই ভাইভগ্নীতে ধরাশয্যায় পড়িয়া রহিলেন। কষ্টের অবধি নাই।

অলকা বয়স্থা হইল। যৌবনের নবকান্তিতে তাহার শরীর পূরিয়া উঠিল। দরিদ্রতার অনলতাপে তাহার যৌবনকুসুম কিয়ৎ পরিমাণে মলিনতা প্রাপ্ত হইলেও, তাহার রূপের তুলনা ছিল না। ব্রজেন্দ্র ভগ্নীর জন্য বিশেষ চিন্তিত হইলেন। দরিদ্র কুলিনব্রাহ্মণের ঘরে কন্যাদায় কি বিপজ্জনক, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অন্যের বুঝিবার সামর্থ নাই।

হরগোবিন্দ মাঝে মাঝে হরিবল্লভপুরে যাইতেন। ঘটনা-চক্রে অলকা তাঁহার নেত্রপথবর্ত্তিনী হইল। যৌবনের উন্মত্ত-তায় অলকা হরগোবিন্দের সরল কথায় মুগ্ধ হইল—তাঁহার বিপুল ধনসম্পত্তির মোহে মজিল। তাঁহার সহিত কুলত্যাগ করিয়া স্নেহময় ভ্রাতার মস্তকে লোকাপবাদের দুর্ব্বিবহ ভার ন্যস্ত করিয়া যাইতে স্বীকৃত হইল। উদ্দামযৌবনের অতৃপ্ত লালসায় হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিলে, লোকের হিতাহিত জ্ঞান থাকে না—সংসারের লোকনিন্দার দিকে দৃষ্টিপাত করে না। মোহে মজিয়া, স্বার্থপরতার ক্ষুদ্র গণ্ডিমধ্যে বংশ-মর্য্যাদা, আত্মীয় স্বজনের জীবনের সুখশান্তি পর্য্যন্ত বলি দিতে কুণ্ঠিত হয় না। অলকার সেই দশা ঘটিল। জীবনের সন্ধিস্থলে, যে সময়ে হৃদয়মধ্যে আকাঙ্ক্ষার অনলশিখা ধিকি ধিকি জ্বলিয়া উঠে, বাসনানিলে হৃদয়কুঞ্জের প্রত্যেক পত্রপুঞ্জ কম্পিত হইয়া উঠে—হৃদয়তড়াগে কামনার তরঙ্গ নাচিয়া উঠে, সেই সময়ে

হরগোবিন্দ তাহার নেত্রসমীপে উপস্থিত হইল। অলকা পতঙ্গ হরগোবিন্দের রূপানলে পুড়িয়া মরিল।

হরগোবিন্দ অলকা অপেক্ষা বয়সে অনেক বড়। কিন্তু তিনি অর্থে কুবের, রূপেও কামদেব অপেক্ষা ন্যূন নহেন। অলকা দরিদ্রের কন্যা, যৌবনের উদ্বেগে রূপ এবং অর্থের মোহে মজিয়া পাপের গহ্বরে ঝাঁপ দিল। হরগোবিন্দ বিশ্বস্ত লোক নিয়োজিত করিয়া শৈলপুরে প্রস্থান করিলেন। যথা সময়ে অলকা তথায় উপস্থিত হইল। শৈলপুরে উপস্থিত হইবামাত্র অলকার হৃদয়ে অনুতাপ দেখা দিল।

ব্রজেন্দ্র স্থানান্তরে গিয়াছিলেন, বাটী ফিরিয়া দেখিলেন, অলকা গৃহে নাই। ব্রজেন্দ্রের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। গ্রামের মধ্যে, নদীতটে, প্রান্তরের নানাস্থানে অন্বেষণ করিলেন, কোথাও অলকার দর্শন পাইলেন না। অলকা যে কুলমানে জলাঞ্জলি দিয়া, কোন প্রণয়-পাত্রের সহিত পলায়ন করিয়াছে, এ কথা বিশ্বাস করিতে ব্রজেন্দ্রের হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। অবশেষে যখন কোন স্থানে তাহার সন্ধান পাওয়া গেল না, তখন তাহার মনে ধারণা জন্মিল, অলকা নিশ্চয়ই গৃহত্যাগ করিয়া গিয়াছে।

অলকার গৃহত্যাগের ছয় বৎসর পর ঘটনাচক্রে পড়িয়া আজ তাহার সহিত ব্রজেন্দ্রের সাক্ষাৎ হইল।

ব্রজেন্দ্র কহিলেন, "সে রাত্রি আমি কাঁদিয়া কাটাইলাম। প্রাতঃকালে সাধের জন্মভূমির নিকট বিদায় লইয়া বাহির হইলাম। আমার মনের স্থিরতা ছিল না, কত পথ হাঁটিয়া কোথায় আসিয়াছি, তাহার কিছুমাত্র জ্ঞান ছিল না। যখন

সন্ধ্যা হইবার উপক্রম হইল, তখন দেখিলাম, আমি এক বন-প্রান্তে উপস্থিত : সম্মুখে গভীর অরণ্যানী, পশ্চাতে বামে দক্ষিণে বিস্তৃত প্রান্তর। আমি জীবনের প্রতি মমতাশূন্য হইয়া, বনমধ্যেই প্রবেশ করিলাম। দেখিতে দেখিতে সূর্য্যদেব অস্ত গেলেন, রাশি রাশি অন্ধকার আসিয়া বনভূমি আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। শব্দহীন, বায়ুচলাচলবিহীন, নীরব বনস্থলীর সান্ধ্য-দৃশ্য বড় চমৎকার—আমি সমস্ত দিবসের পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়াছিলাম—এক্ষণে প্রকৃতির মুক্তপ্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া, বনভূমির ধীরসঞ্চালিত পবনহিল্লোলে আমার শ্রান্তি অনেকটা দূর হইল, মনের অবসাদ অনেকটা কমিল। আমি একটী বৃক্ষমূলে বসিয়া পড়িলাম। ক্রমশঃ তারাকুন্তলা রজনীর গভীরতা যতই বাড়িতে লাগিল—বনাঞ্চলের নীরবতাও ততই যেন ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধরিতে আরম্ভ করিল। আশে, পাশে, সম্মুখে, পশ্চাতে ঊর্দ্ধে—যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকেই ঘন সমাচ্ছন্ন বিটপীর সমাবেশ। মাঝে মাঝে পত্রহীন, কাণ্ডবিহীন বনান্ত-রালের মধ্য দিয়া নবেন্দুর কিরণরেখা বনের মধ্যে আসিয়া পড়িতেছিল—পবনান্দোলিত শাখা প্রশাখার সহিত সেই ছিদ্রবাহী কিরণরেখাগুলিও কাঁপিতেছিল,—গতিশীল আলো-কের ন্যায় ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইতেছিল। আমি বসিয়া বসিয়া তাহাই দেখিতেছিলাম, সহসা বনমধ্য হইতে কোন হতভাগ্যের যন্ত্রণাসূচক আর্ত্তনাদ আমার কর্ণে আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি শিহরিয়া উঠিলাম। আবার সেই করুণ আর্ত্ত-নাদ। আমি স্থির থাকিতে পারিলাম না, শব্দ লক্ষ্য করিয়া সেই দিকে চলিলাম। কিছুদূর অগ্রসর হইবামাত্র একখানি

সামান্য কুটীর দেখিতে পাইলাম। কম্পিতহৃদয়ে কুটীরের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলাম। কুটীর অন্ধকার। কুটীরাধিকারী কে, তাহার অবস্থা কিরূপ, বুঝিতে পারিলাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কুটীরে কে আছ ?'

"ভিতর হইতে এক ব্যক্তি ক্ষীণকণ্ঠে কহিল, 'জল—বড় পিপাসা!' কণ্ঠস্বরে বুঝিলাম, কোন হতভাগ্যের মুমূর্ষু দশা উপস্থিত। আমি সাহসে ভর করিয়া কুটীরমধ্যে প্রবেশ করিলাম, পুনরায় উচ্চকণ্ঠে জিজ্ঞাসিলাম, 'অন্ধকারে জল কোথায় পাইব ?'

"সে ব্যক্তি সেইরূপ ভগ্নস্বরে বলিল, 'ঘরে সব আছে, আলো জ্বাল, বড় পিপাসা—জল।'

"আমি হস্ত সঞ্চালন করিয়া, ক্ষুদ্র কুটীরের ইতস্ততঃ সন্ধান করিতে করিতে আলোক জ্বালিবার উপকরণ পাইলাম। চক্‌মকির সাহায্যে আলোক জ্বালিলাম। কুটীরের এক কোণে কুলঙ্গির মধ্যে একটী প্রদীপ দেখিতে পাইলাম। প্রদীপ জ্বালিত হইলে, একবার কুটীরস্বামীর দিকে চাহিয়া দেখিলাম। মৃত্যুর মলিন ছায়া তাহার বিকটাকার মুখের উপর অনেকক্ষণ পড়িয়াছে। ইঙ্গিতে আমায় জল দিতে বলিল। গৃহকোণে মৃৎকলসে জল ছিল—আমি একটা মৃৎপাত্রে ঢালিয়া তাহার মুখে দিলাম। লোকটা একটু সুস্থির হইল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তুমি নির্জ্জন বনে একা বাস কর কেন ?'

"সে ব্যক্তি ক্ষীণকণ্ঠে কহিল, 'আমি দস্যু—নগর গ্রাম লুঠ করিয়া এইখানে আনিতাম—আমার দলে আরও অনেক লোক ছিল—আমার এক স্ত্রী ছিল—আমার এই দশা দেখিয়া,

আমার যা ছিল, লইয়া পলাইয়াছে—ঠিক করিয়াছে, আমি পাপী—পাপের সাজা হইতেছে।' তাহার পর একদৃষ্টে আমার দিকে চাহিয়া কহিল, 'আপনি ব্রাহ্মণ?' আমি কহিলাম, 'হাঁ'। দস্যু কহিল, 'আর একটু জল দাও—বড় উপকার করিলে।'

"দস্যু পুনরায় জল পান করিয়া কহিল, 'তাহারা আমার সব লইতে পারে নাই—এক স্থানে আমার বিস্তর অর্থ পোঁতা আছে—ঠাকুর, আমার মাথায় পায়ের ধূলা দাও—আমি তোমায় সব দিয়া যাইব।' আমি দস্যুর প্রস্তাবানুযায়ী কার্য্য করিলে কহিল, 'সোজা রাস্তা ধরিয়া কিছুদূর যাইলে, একটী বড় বকুল গাছ দেখিতে পাইবে—তাহার নীচে এক জায়গায় খানকতক ইট পড়িয়া আছে, সেই জায়গাটা খুঁড়িলে বিস্তর অর্থ পাইবে—রাজা—'

"দস্যু আর বলিতে পারিল না। তাহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইল। বিস্তর ধনরত্ন মাটীর মধ্যে পোঁতা থাকিবে, কাহাকেও দিয়া যাইতে পারিব না ভাবিয়াই, যেন এতক্ষণ তাহার প্রাণবায়ু নির্গত হয় নাই,—এক্ষণে আমাকে ঐ সংবাদ দিবামাত্র তাহার আত্মা ভৌতিকদেহ ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিল। আমি বনমধ্যে দস্যুর মৃতদেহপার্শ্বে বসিয়া রহিলাম।

"প্রভাত হইতে আর বিলম্ব নাই দেখিয়া, কুটীর হইতে বাহির হইলাম। বনে শুষ্ক কাষ্ঠের অভাব নাই। প্রচুর পরিমাণে কাষ্ঠ সংগ্রহ পূর্ব্বক, কুটীরের সম্মুখে স্তূপাকার করিলাম। সর্ব্বভুক অনলস্পর্শে স্তূপীকৃত কাষ্ঠরাশি জ্বলিয়া উঠিল। আমি দস্যুর মৃতদেহ অনলে নিক্ষেপ করিলাম। প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই দস্যুদেহ পুড়িয়া ভস্ম হইয়া গেল।

নিকটে একটী ক্ষুদ্র নদী ছিল, তাহাতে স্নান করিয়া, অঞ্জলি-বদ্ধ পূর্ব্বক জলপান করিলাম। পূর্ব্ব দিবসের অনাহারক্লেশ অনেকটা উপশমিত হইল।

"এখন আমার প্রধান ভাবনা, দস্যুর অর্থ গ্রহণ করিব কি না। নিরীহ নরনারীর শোণিতরঞ্জিত দস্যুসঞ্চিত অর্থ গ্রহণে প্রত্যবায় আছে কি না? বেশীক্ষণ চিন্তা করিবার বা শাস্ত্রের মর্ম্মানুসন্ধান করিবার আমার প্রয়োজন হইল না। ভাবিলাম, আজ যদি আমার অর্থ থাকিত, অলকার বিবাহ দিতে পারিতাম, তাহা হইলে, সে আমার মুখে কালি দিয়া কুল ছাড়িয়া যাইত না। অর্থই মূলাধার---অর্থেই সংসারে মান সম্ভ্রম ক্ষমতা সমস্তই পাওয়া যায়—আমি দস্যু-কথিত বকুল-বৃক্ষের সন্ধানে চলিলাম। কুটীর হইতে একখানি মৃত্তিকা খননোপ-যোগী অস্ত্র সংগ্রহ করিলাম।

"কুটীর হইতে অল্পদূরেই একটী বকুলবৃক্ষ দেখিতে পাইলাম। তাহার পার্শ্বে এক স্থানে কয়েকখানি ইষ্টকখণ্ড পতিত রহিয়াছে, আমি সেগুলি অপসারিত করিয়া খনন করিতে লাগিলাম। অল্পায়াসেই গভীর গর্ত্ত হইল—আর কিছু খনন করিবামাত্র চারিটী বড় বড় পিত্তল কলস দেখিতে পাইলাম। আনন্দে আমার হৃদয় নাচিয়া উঠিল। হীরা পান্না মুক্তা প্রভৃতি বহু-মূল্যের প্রস্তর, অলঙ্কার এবং নগদ টাকায় চারিটী কলস পূর্ণ। এখন আমার আর এক ভাবনা জুটিল, এত অর্থ বন হইতে কিরূপে লইয়া যাইব। কিছুক্ষণ চিন্তার পর স্থির করিলাম, হরিবল্লভপুরে আর ফিরিব না কিংবা তাহার নিকটবর্ত্তী কোন স্থানেও বাস করিব না। আমি ধনরত্ন

বলবান হইলেও, লোকে আমার ভগ্নীর কথা লইয়া আন্দোলন করিতে ছাড়িবে না। আমি এমন কোন স্থানে যাইব, যেখানে আমায় কেহ চেনে না।

"আমি চারিটী কলস চারি স্থানে পুঁতিয়া রাখিলাম। একটী কলস হইতে সামান্যমাত্র অর্থ লইয়া, নিকটবর্ত্তী একটী গ্রামে যাইয়া বাটী ভাড়া করিলাম। অতি অল্পদিনের মধ্যেই অল্পে অল্পে অর্দ্ধেক ধনসম্পত্তি সেই স্থান লইয়া গেলাম। সে স্থানে কিছুদিন বাস করিবার পর, অপর এক স্থানে প্রায় দুই বৎসর কাটাইলাম। তাহার পর শৈলপুরে স্থায়ীভাবে বাস করিবার জন্য আসিয়াছি। অর্দ্ধেক ধনরত্ন এখনও বনমধ্যে গুপ্ত আছে—অবসর মত আনিব ইচ্ছা করিয়াছি। এখানে অট্টালিকা, উদ্যান প্রভৃতি ক্রয় করিয়াছি, কিন্তু অলকা! এখানেও বুঝি আমার বাস করা হইল না।"

ব্রজেন্দ্রের এই কথা অলকার প্রাণে তীক্ষ্ণশর তুল্য বিদ্ধ হইল। অলকা ভ্রাতার মুখপানে চাহিয়া কাতরস্বরে কহিল, "আমি অভাগিনী,—আমার দ্বারা সমস্ত নষ্ট হইল!"

ব্রজেন্দ্র কহিলেন, "ভবিতব্য নিবারণ করিবার হাত কাহারও নাই। আমরা যে পরস্পর সহোদর সহোদরা, এ কথা লোকের নিকট প্রচারিত না হইলেই হইল। তুমি আমার পরিচিতা এবং এক গ্রামস্থ এইরূপ পরিচয় দিলেই যথেষ্ট হইবে।"

এই সময়ে অলকা বারান্দার মুক্তগবাক্ষের দিকে চাহিয়া চীৎকার করিয়া কহিল, "দাদা—ঐ আবার সেই মুখ!"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সন্দেহ।

ব্রজেন্দ্র তাড়াতাড়ি উঠিয়া, কক্ষদ্বার মুক্ত করিয়া, বাহিরে গেলেন, আলোক লইয়া অনেক অনুসন্ধান করিলেন কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। ফিরিয়া আসিয়া কহিলেন, "অলকা! তোমার ভ্রম হইয়া থাকিবে।"

অলকা কহিল, "না দাদা! আমার ভ্রম নয়—সত্য সত্য আমি এক রমণীকে গবাক্ষের ধারে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়াছি।"

ব্রজেন্দ্র। নীচে পর্য্যন্ত সন্ধান করিলাম, রমণী কি শূন্যে মিশিয়া গেল!

অলকা। ঐ রমণীর সকলই অলৌকিক! আমি তাহাকে পূর্ব্বে আরও দুইদিন দেখিয়াছি। তাহার চক্ষু দেখিলে. ভয়ে আমার অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠে!

ব্রজেন্দ্র। সে রমণী কে? তাহাকে তোমার এত ভয়ের কারণ কি?

অলকা। তোমায় আদ্যোপান্ত বলিতেছি, তুমি বুঝিতে পারিবে। আমি যে বাড়ীতে বাস করিতাম, সে বাড়ী মালতী

নাম্নী একটী স্ত্রীলোকের। তাহার ছেলের নাম শঙ্কর। শঙ্কর জমীদার বাটীর জনৈক ভৃত্য। শৈলপুরে আসিয়া মালতীর বাড়ীতে গোপনে বাস করিতে লাগিলাম। দুই বৎসর এইরূপে কাটিল—ইহার মধ্যে আমি বাড়ী হইতে বাহির হই নাই। তৃতীয় বৎসরে একদিন আমি মালতীর সহিত ভুবনেশ্বরী মন্দিরে আরতি দেখিতে গিয়াছিলাম। সেখানে সে দিন অনেক স্ত্রীলোকের সমাগম হইয়াছিল। সহসা আমার দৃষ্টি দেবীমূর্ত্তির পার্শ্ববর্ত্তিনী এক যুবতীর উপর পতিত হইল। সেরূপ সুন্দরী আমি পূর্ব্বে আর কখনও দেখি নাই। আমার বোধ হইতে লাগিল, যুবতী আমার মুখের দিকে সাভিনিবেশ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। আমি মুখের অবগুণ্ঠন আরও টানিয়া দিলাম। তাহার তীব্রদীপ্তিনয়নের দিকে চাহিতে আমার প্রাণে আশঙ্কা হইতে লাগিল। আমি আরতি দেখিতে লাগিলাম কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরে, যুবতীর দিকে আর একবার চাহিয়া দেখিলাম, সে আমার দিকে তখনও সেই ভাবে চাহিয়া আছে। তাহার চক্ষু হইতে বিদ্যুৎবহ্নি বাহির হইয়া আমার হৃদয়কে পর্য্যন্ত যেন ভস্মীভূত করিতেছে। আমি তাহার ভ্রূকুটীকুটিল মুখের দিকে অধিক-ক্ষণ চাহিয়া থাকিতে সাহস করিলাম না। কামিনী যেমন অপূর্ব্ব সুন্দরী, তেমনি ভয়ঙ্করী। আমি বাড়ী আসিয়া মালতীকে সকল কথা বলিলাম। রমণীর আকৃতি, প্রকৃতি বর্ণন করিলাম। মালতী কাহারও নিকট এ কথা বলিতে নিষেধ করিয়া কহিল, তোমার চিত্তের বিকারবশতঃ ওরূপ বোধ হইয়াছে।

ব্রজেন্দ্র। মালতীর কথাই ঠিক। হৃদয়বিকারে মাঝে মাঝে অমন অস্বাভাবিক অনেক ঘটনা দৃষ্ট হয়।

বাধা দিয়া অলকা কহিল, "হৃদয়বিকার নয় দাদা! তাহার পর শোন। কুড়ি পঁচিশ দিন পূর্ব্বে আমি আমার ঘরে শুইয়া আছি, রাত্রি বেশী হয় নাই। শুইয়া থাকিতে থাকিতে, আমার বেশ নিদ্রা আসিয়াছে। একটা কিসের শব্দে সহসা চাহিয়া দেখি, আমার মুখের দিকে তীব্র কটাক্ষ সঞ্চালন করিয়া, ভুবনেশ্বরীমন্দিরের সেই রমণী দাঁড়াইয়া আছে। তাহার নীলোজ্জ্বল নেত্র দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছে। আমার মুখের উপর মুখ নত করিয়া কি দেখিতেছে। ভয়ে আমার বাক্‌শক্তি রহিত হইল। চীৎকার করিতে পারিলাম না, ভয়ে ভয়ে আপনা হইতে চক্ষু মুদিয়া আসিল। মুহূর্ত্ত পরে চক্ষু মেলিয়া দেখি, রমণী নাই। তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িলাম—মনে একটা সন্দেহ হইল,—সিন্দুকের নিকট গিয়া দেখি, তাহার ডালা খোলা। আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে। ধনরত্ন যাহা ছিল, প্রায় সবই গিয়াছে। মালতীকে ডাকিলাম—সে বাড়ী ছিল না। কিয়ৎক্ষণ বিলম্বে আসিয়া, সকল শুনিয়া বিস্মিত ও ভীত হইল। সে বাহিরের দরজা খুলিয়া রাখিয়া গিয়াছিল, তাহারই অসাবধানতায় চোর আসিয়া আমার সর্ব্বস্ব লইয়া গেল, আমি তাহাকে তিরস্কার করিলাম। সে আমার পায়ে ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল, এবং এ কথা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিল। আমি শুনিয়াছিলাম, বাবুর কন্যা সুন্দরী; তাহার উপরেই আমার সন্দেহ হইল। কারণ এ চুরিতে কিছু রহস্য ছিল। তাহার মাতার ব্যবহৃত যে সমস্ত অলঙ্কার আমার হস্তগত হইয়াছিল, কেবল সেই সমস্তই অপহৃত হইয়াছে। আমি মালতীকে আমার সন্দেহের কথা বলিলাম। সে বাবুর

কন্যা যমুনার যেরূপ রূপের বর্ণনা করিল, তাহাতে আমি বুঝিলাম, আমার সন্দেহের কোন ভিত্তি নাই। যমুনা কালা বোবা, তাহার দ্বারা এ কার্য্য অসম্ভব।”

ব্রজেন্দ্র অলকার কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলেন, কহিলেন, “সে রমণীর অভিসন্ধি যে মন্দ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।”

অলকা। তোমার বাড়ীতে সে কি প্রকারে আসিল?

ব্রজেন্দ্র। আমার বাড়ীতে অপর কাহারও প্রবেশ করিবার সম্ভাবনা নাই। ডাক্তার নিরঞ্জন বাবু এবং আমার বাটীর মধ্যে একটী ফুলের বাগান আছে। বাগানে সামান্য বেড়া মাত্র—ডাক্তারের বাড়ীর কোন স্ত্রীলোক কৌতূহলের বশবর্ত্তিনী হইলে, আমার বাড়ীতে আসা তাহার অসাধ্য হয় না, কারণ আমার খিড়কির দরজায় কবাট নাই।

অলকা। ডাক্তারের সহিত বাবুর বাটীর ঘনিষ্টতা আছে। বাবুর বাড়ীর কোন স্ত্রীলোকের ডাক্তারের বাড়ীতে আসা বা অবস্থান করা অসম্ভব নয়।

ব্রজেন্দ্র। যেই হউক, ভবিষ্যতে যাহাতে আমার বাড়ীতে আর কেহ না আসিতে পারে, কল্যই তাহার উপায় বিধান করিব। তুমি এখানে নিশ্চিন্ত থাক—তোমার কোন অভাব হইবে না। আমরা যে ভাই ভগ্নী, সেই থাকিব, লোকে জানিবে মাত্র, তুমি আমার দেশস্থ।

রাত্রি প্রায় অবসান হইয়া আসিয়াছিল। অলকা সেই কক্ষেই শুইল, ব্রজেন্দ্র অপর কক্ষে যাইয়া রাত্রির অবশিষ্টাংশ অতিবাহিত করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পাষাণে কোমলতা।

পর দিবস সন্ধ্যার সময় অজয়কুমার অন্তঃপুরসংলগ্ন বৈঠক-খানায় বসিয়া আছেন। বসিয়া বসিয়া পিতার অদ্ভুত আদে-শের বিষয় আলোচনা করিতেছেন, এমন সময়ে এক পরি-চারক আসিয়া সংবাদ দিল, কোন ভদ্রলোক দেখা করিতে আসিয়াছেন। অজয়কুমার তাঁহাকে তথায় আনিতে অনুমতি করিলেন।

অবিলম্বে ব্রজেন্দ্র সেই কক্ষে উপস্থিত হইলেন। অজয় দণ্ডায়মান হইয়া নবাগতের অভ্যর্থনা করিলেন।

ব্রজেন্দ্র নম্রস্বরে কহিলেন, "অজয় বাবু! গতকল্য যখন আপনার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তখন আমার মানসিক অবস্থা ভাল ছিল না। আমার অশিষ্ট ব্যবহারের জন্য আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে আসিয়াছি।"

অজয়ও শিষ্টতা প্রদর্শন করিয়া কহিলেন, "আমি আপনার কথায় বা ব্যবহারে কিছুমাত্র রুষ্ট হই নাই। সে রমণী আপনার কি কোন আত্মীয়া?"

ব্রজেন্দ্র। না—আমরা পরস্পর পরিচিত, এক গ্রামস্থ। তাহার পিতা মাতার সহিত আমাদের যথেষ্ট হৃদ্যতা আছে। আহা হতভাগিনীর কুলত্যাগে, তাহার আত্মীয়স্বজনের লোকের নিকট আর মুখ দেখাইবার উপায় নাই।

অজয়। আমার পিতাই তাঁহাদের এই কলঙ্কের হেতু। ওহো! পিতৃদোষেও সময়ে সময়ে পুত্রকে সমাজে নানা-প্রকারে কলঙ্কিত এবং অপদস্থ হইতে হয়। এখন মহাশয়! বলুন, আমার দ্বারা তাঁহাদের কোন উপকার হইতে পারে কি না?

ব্রজেন্দ্র। তাঁহারা আপনার নিকট কোন প্রকার উপকারের প্রত্যাশী নহেন। আপনার পিতাকর্তৃক তাঁহাদের যে অনিষ্ট সাধিত হইয়াছে, পার্থিব কোন পদার্থের বিনিময়ে তাহার শতাংশের একাংশও পূরণ করা যাইতে পারে না।

অজয়কুমার লজ্জায় অধোবদন হইলেন। তাহার পর কহিলেন. "সে স্ত্রীলোকটী এখন কোথায়?"

ব্রজেন্দ্র। আমার আশ্রয়েই থাকিবে। আমি তাহাকে ভগ্নীর ন্যায় স্নেহ করি।

এই সময়ে গৃহদ্বার মুক্ত করিয়া, যমুনা তথায় উপস্থিত হইল কিন্তু অজয়ের নিকট একজন অপরিচিত যুবক বসিয়া আছে দেখিয়া, প্রস্থানোদ্যত হইল। অজয় তাহাকে হস্তসঙ্কেতে ডাকিয়া, একখণ্ড কাগজে লিখিয়া জানাইলেন, "কাল যে স্ত্রীলোকের কথা তোমায় বলিয়াছি, ইনি তাহার বিশেষ পরিচিত—সে স্ত্রীলোকটী এখন ইহাঁর আশ্রয়েই আছে।"

যমুনা কাগজখানি পড়িয়া, ব্রজেন্দ্রের দিকে একবার মুখ

তুলিয়া চাহিল। সেই নীলোজ্জ্বল নয়নের স্নিগ্ধদৃষ্টি মুহূর্ত্তের জন্য ব্রজেন্দ্রের মুখের উপর স্থাপিত হইল।

অজয় কহিলেন, "মহাশয়! ইনি আমার জ্যেষ্ঠা সহোদরা। আমাদের কোন কথাবার্ত্তা শুনিবার বা ইহাতে যোগ দিবার ইঁহার ক্ষমতা নাই। বিধির বিড়ম্বনায় অভাগিনী শ্রবণশক্তি এবং বাক্‌শক্তি হইতে বঞ্চিত হইয়াছে।"

ব্রজেন্দ্র আর একবার যমুনার মুখপ্রতি চাহিয়া দেখিলেন। সেই সুন্দরীর অনুপম রূপরাশি—সুন্দর মুখকান্তি—মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহার হৃদয়ে একটা পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া দিল। যমুনাও নীরবে তাঁহার মুখপানে চাহিয়া আছে—সেই কর্ণবিশ্রান্ত পদ্মনেত্রের বিলোল-কটাক্ষ—তাঁহার হৃদয় পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতেছে। সে কটাক্ষে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নাই—তীব্রতা নাই—বিদ্যুদ্দামের বিকাশ নাই। সে কটাক্ষ সরল, মধুর, সহাস। তাহাতে যেন কেমন একটা মাদকতা আছে, কেমন একটা মোহ আছে—কেমন একটা কি বিজড়িত রহিয়াছে। ব্রজেন্দ্র চক্ষু ফিরাইতে পারিলেন না—একদৃষ্টে সেই মূক বধির যুবতীর মুখপদ্মের দিকে লোলুপনেত্রে চাহিয়া রহিলেন। অজয় অন্যমনস্ক ছিলেন, ব্রজেন্দ্রের সে ভাব লক্ষ্য করেন নাই।

এদিকে যমুনার হৃদয়েও চাঞ্চল্য জন্মিল। যমুনা এ পর্য্যন্ত কোন পুরুষের প্রতি এরূপ ভাবে দৃষ্টিপাত করে নাই—কখন তাহার দৃষ্টি কাহারও উপর এত অধিকক্ষণ স্থায়ীভাবে থাকে নাই। যমুনা মূক বধির যুবতী কিন্তু তাহার হৃদয় নারীজাতির হৃদয়ের উপকরণে গঠিত। পুষ্পধন্বার পঞ্চশর সর্ব্বত্র অব্যাহত। ব্রজেন্দ্রকে দেখিয়া যমুনা পঞ্চশরের বশীভূত হইল।

অজয়ের কথার প্রত্যুত্তরে ব্রজেন্দ্র কহিলেন, "আহা, এমন সুন্দরী মূক এবং বধির! ইঁহার কি জন্মাবধি এই অবস্থা?"

অজয়। না মহাশয়—আমার মাতার মৃত্যুর পর ইঁহার কঠিন পীড়া হয়। সেই অবধি ইঁহার এই অবস্থা?"

ব্রজেন্দ্র গাত্রোত্থান করিলেন। অজয় তাঁহাকে তাঁহাদের বাটীতে সর্ব্বদা যাতায়াত করিতে অনুরোধ করিলেন। যমুনাও ইঙ্গিতে তাঁহাকে আসিতে অনুরোধ করিলেন। ব্রজেন্দ্র সম্মত হইয়া প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলেন। যমুনার সেই কৃষ্ণতার নয়নের বিলোল কটাক্ষ, অজয়ের অজ্ঞাতে ব্রজেন্দ্রকে অনেক কথা বলিল। ব্রজেন্দ্র প্রস্থান করিলেন—মূক বধির যুবতীর বিপুল উরস্ চঞ্চল করিয়া, একটী সুদীর্ঘ তপ্তশ্বাস পতিত হইল।

যমুনা পিতার ন্যায় গর্ব্বিত এবং উদ্ধতপ্রকৃতি। তাহার আচরণে বাড়ীর দাস দাসী ভয়ে কম্পিত। মুখ দিয়া কর্কশ কটু বাক্য বিনির্গত না হইলেও, তাহার ক্রোধবিস্ফারিত নয়নদ্বয় হইতে যে নীরব ভর্ৎসনা বাহির হইত, তাহাই যথেষ্ট। ফণিনীর ক্রূরতা এবং দংষ্ট্রানির্গত বিষভয়ে যেমন কেহ, তাহার মস্তকমণি গ্রহণ করিতে সাহস করে না, সেইরূপ কোন যুবকও যমুনার তেজস্বিতা ও অহঙ্কারের কথা ভাবিয়া, তাহার দিকে সপ্রেমদৃষ্টি সঞ্চালন করিতে সাহস করিত না। ভ্রমরকৃষ্ণ নয়ন হইতে যে অস্বাভাবিক তেজ বাহির হইত, তাহার সম্মুখে সকল যুবককেই মস্তক নত করিতে হইত। যমুনার হৃদয় কঠিন পাষাণবৎ হইলেও, আজি তাহাতে কোমলতা দেখা দিল। পুষ্পচাপের শরাঘাতে পাষাণেও পুষ্প ফোটে—মরুভূমিতেও প্রবাহিণী ছোটে!

অষ্টম অধ্যায়।

উইল পাঠ।

যথাসময়ে হরগোবিন্দ চৌধুরীর শ্রাদ্ধাদি মহাসমারোহে সমাহিত হইল। নিমন্ত্রিত আত্মীয়কুটুম্ব, আহূত, অনাহূত, জনসাধারণে কয়েক দিবস শৈলপুরের জমিদারবাটী পরিপূর্ণ হইয়া রহিল। শ্রাদ্ধান্তে যে যাহার স্থানে প্রস্থান করিল, বিশাল সৌধমালা পুনরায় লোককোলাহলশূন্য নীরব নিস্তব্ধ বনস্থলীবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

শ্রাদ্ধের একমাস পরে চৌধুরী মহাশয়ের প্রাচীন বন্ধু কালীনাথ বাবু একটী পুলিন্দা লইয়া উপস্থিত হইলেন। কালীনাথ বাবু প্রবীণ বিচক্ষণ ব্যক্তি, বয়ঃক্রম ষাইট বৎসরেরও অধিক হইবে। তিনি মৃত জমিদার মহাশয়ের বড়ই বিশ্বাসভাজন।

চৌধুরী বাটীর দ্বিতল বিস্তৃত বৈঠকখানা গৃহে এক বৈঠক বসিল। বৈঠকে বসিলেন কালীনাথ বাবু, ডাক্তার নিরঞ্জন বাবু, কুলপুরোহিত দিগম্বর ভট্টাচার্য্য, নব জমিদার অজয়কুমার চৌধুরী এবং ভিন্নাসনে অর্দ্ধাবগুণ্ঠনা যমুনা।

হরগোবিন্দ চৌধুরী জীবতাবস্থায় তাঁহার বিষয়ের দানপত্র বা উইল্ প্রস্তুত করিয়া যান। তাঁহার মৃত্যুর পর, শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সমাহিত হইলে, কালীনাথ বাবুকে উইল পাঠ করিতে আদেশ করিয়া যান। অদ্য কালীনাথ বাবু উইল পাঠ করিতে আসিয়াছেন।

যমুনার চক্ষু প্রদীপ্ত, প্রজ্জ্বোল। যমুনা মাঝে মাঝে অপরের অজ্ঞাতে নিরঞ্জন বাবুর মুখের দিকে চাহিতেছে। ডাক্তার বাবুও তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন। সে দৃষ্টি বিনিময়ের অর্থ অন্যের অনধিগম্য। যমুনার সে নীরব শান্তপ্রকৃতি কিন্তু ডাক্তার বাবুর ভাল বোধ হইতেছে না। তিনি অনেকক্ষণ তাহার মুখপ্রতি চাহিয়া, একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন।

কালীনাথ বাবু সঙ্গে যে পুলিন্দাটা আনিয়াছেন, তাহার উপরে রীতিমত শীলমোহর করা। কালীনাথ বাবু সকলের সমক্ষে শীলমোহর ভঙ্গ করিয়া, উইল পাঠ করিতে লাগিলেন।

উইলের মর্ম্ম,—আমার স্থাবর অস্থাবর যাহা কিছু সম্পত্তি আছে, আমার মৃত্যুর পর কালীনাথ বাবু এবং ডাক্তার নিরঞ্জন বাবু তাহার তত্ত্বাবধারক নিযুক্ত হইবেন। অজয়কুমার তাহার ত্রিংশবর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত, তাঁহাদের কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকিবে। ইহার মধ্যে আমার বিষয়ের উপসত্ব ভিন্ন অন্য পদার্থে,—কোন স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তিতে, তাহার কোন সত্ত্ব থাকিবে না। ত্রিংশবর্ষ বয়ঃক্রম উত্তীর্ণ হইয়া, যে দিবস একত্রিংশ বর্ষ বয়ঃক্রমে পতিত হইবে, সেই দিন হইতে উইলে লিখিত সর্ত্তানুসারে সমস্ত সম্পত্তি তাহাকে বর্ত্তিবে। কালীনাথ বা নিরঞ্জন বাবুর আর কোন তত্ত্বাবধায়কতার

আবশ্যক রহিবে না। কিন্তু অজয়ের এই ত্রিংশ বর্ষ বয়ঃক্রমের পূর্ব্বে যদি চিকিৎসাবিদ্যার সাহায্যে অথবা কোন দৈব-উপায়ে যমুনা তাহার প্রনষ্ট বাক্‌শক্তি এবং শ্রবণশক্তি পুনঃ প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে, নন্দীগ্রামের জমিদারী ব্যতীত, বিষয়ের তাবৎ অংশ যমুনা পাইবে। যমুনা ইচ্ছা করিলে, এ বিষয় কাহাকেও হস্তান্তরিত করিতে পারিবে না—কাহাকেও দান করিয়া যাইতে পারিবে না। যদি তাহার বিবাহ হয় এবং তাহার গর্ভে সন্তানাদি জন্মে, তাহারা উত্তরাধিকারীসত্বে সত্ববান হইয়া, ভোগ দখল করিবে। যদি তাহার বিবাহ বা সন্তানাদি না হয়, তবে তাহার মৃত্যুর পর অজয় সমুদয় বিষয়ের প্রকৃত প্রস্তাবে মালিক হইবে। অজয়ের ত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রমের পূর্ব্বে যদি যমুনার শ্রবণশক্তি বা বাক্‌শক্তি পুনঃ প্রাপ্ত না হয়, তবে সে আমার পরিত্যক্ত বিষয়ের সত্ব হইতে আজীবন মাসে সহস্র মুদ্রা করিয়া, ব্যয় করিতে সমর্থ হইবে।

কালীনাথ বাবু সর্ব্বসমক্ষে উচ্চৈঃস্বরে উইল পাঠ করিলেন। শ্রোতৃবর্গ উইলের মর্ম্মাবগত হইয়া বিস্মিত এবং স্তম্ভিত হইল। কালীনাথ বাবু এবং পুরোহিত ভট্টাচার্য্য মহাশয় কিছু মাত্র বিচলিত হইলেন না, কারণ তাঁহারা পূর্ব্ব হইতেই তাবৎ বিষয় পরিজ্ঞাত ছিলেন। কালীনাথ স্বয়ং উইলের লেখক এবং ভট্টাচার্য্য মহাশয় সাক্ষী ছিলেন। অজয়কুমার মর্ম্মাহত হইলেন। তাঁহার পিতা লোকান্তর গমনের পূর্ব্বেও তাঁহার প্রতি বিদ্বেষভাব ত্যাগ করিতে পারেন নাই। তাঁহার ভগ্নী মূক বধির না হইলে, তাঁহার পিতা তাঁহাকে যে, সকল সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়া যাইতেন, তাহা অবধার্য্য। বৃদ্ধ ডাক্তার

নিরঞ্জন বাবুর চক্ষু হইতে অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল। অভাগিনী যমুনা অর্দ্ধাবগুণ্ঠনে নতবদনে উপবিষ্টা। উইলের মর্ম্ম তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশলাভ করিল না ভাবিয়া, অজয়-কুমার কালীনাথ বাবুর হস্ত হইতে উইলখানি লইয়া, তাহার মর্ম্মাবধারণের জন্ত যমুনার সম্মুখে ধরিলেন। যমুনা নিবিষ্টমনে উইলখানি পাঠ করিয়া, ঘৃণাবশতঃ সেখানি দূরে নিক্ষেপ করিল। তাহার প্রোজ্জ্বলায়ত নয়নদ্বয় আরও প্রোজ্জ্বল এবং বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। তাহা হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। যমুনা পুনরায় ডাক্তার বাবুর মুখের দিকে চাহিল, তাহার পর একখণ্ড কাগজ লইয়া, তাহাতে লিখিল, "যদি কখন আমার শ্রবণ বা বাক্‌শক্তি প্রত্যাবৃত্ত হয়, আমি বিষয়ের কপর্দ্দকও গ্রহণ করিব না, আমার তাবৎ বিষয় অজয়কে লিখিয়া দিব।"

কালীনাথ বাবু যমুনাদত্ত কাগজখানি পাঠ করিয়া মস্তক সঞ্চালন করিলেন, তাহার পর একখণ্ড কাগজে লিখিলেন, "উইলের মর্ম্মানুসারে বিষয় অপরকে দান করিবার শক্তি তোমার নাই।"

যমুনা কালী বাবুর লেখা পাঠ করিয়া, হৃদয়াবেগ সহ্য করিতে সমর্থ হইল না। কাগজখানি দূরে নিক্ষেপ করিয়া, বেগে উন্মাদিনীবৎ কক্ষ ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিল। অজয়কুমারও ভ্রাতৃবৎসলা জ্যেষ্ঠা সহোদরাকে সান্ত্বনা করিবার অভিপ্রায়ে সে কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

অজয়-সরসী—ব্রজেন্দ্র-যমুনা।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে যে ঘটনা বিবৃত হইল, তাহার একমাস পরে, একদিবস সন্ধ্যার সময়, যমুনা এবং ব্রজেন্দ্র একটী কক্ষমধ্যে উপবিষ্টা আছেন। এটী যমুনার শয়নকক্ষ নহে। তাহার পার্শ্ববর্ত্তী একটী ক্ষুদ্র সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠ। গৃহমধ্যে আলোক জ্বলিতেছে। যমুনা এবং ব্রজেন্দ্র পাশাপাশি বসিয়া আছে। উভয়ের দৃষ্টিই চঞ্চল, সলজ্জ—উভয়েই উভয়ের মুখপ্রতি ক্ষণে ক্ষণে চাহিতেছে। যমুনার বিস্ফারিত নীলোৎপলকান্তি নয়নযুগল আনন্দে উৎফুল্ল—গণ্ডযুগ্ম ঈষৎ রক্তিমাভা-বিজড়িত—ঈষৎ স্থূল, ঈষৎ বর্ত্তুল অধরোষ্ঠ মুহুর্ম্মুহু প্রকম্পিত। যেন কি বলিবার প্রয়াস পাইতেছে—যেন কি প্রকাশ করিবার জন্য হৃদয় ফাটিতেছে, কিন্তু বাক্‌শক্তির অভাবে হৃদয়ভাব, মুখের ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারিতেছে না। কথা মুখে আসিতেছে, ঠোঁটে আসিতেছে, বাহির হইতেছে না। ঠোঁট কাঁপিতেছে। উদ্বেগে, আবেগে হৃদয় বিচলিত হইতেছে, বক্ষ কাঁপিয়া উঠিতেছে। আর ব্রজেন্দ্রের হস্তমধ্যে তাহার নবনীতকোমল করপল্লব ঈষৎ ঘর্ম্মাক্ত হইয়া ধীরে—অতি ধীরে কাঁপিতেছে!

অলকার কুলত্যাগের ছয় বৎসর পরে, হরগোবিন্দ চৌধুরীর চিতাশয্যার পার্শ্বে তাহার সহিত ব্রজেন্দ্রের প্রথম সাক্ষাৎ হয়। প্রথম যখন অলকার মুখে ব্রজেন্দ্র শুনিলেন, হরগোবিন্দ চৌধুরী হইতেই তাহাদের নির্ম্মলকুলে কলঙ্কস্পর্শ করিয়াছে, তখন চৌধুরী-বংশের উপরে তাঁহার বিজাতীয় ক্রোধের সঞ্চার হইয়াছিল। এরূপ ক্রোধ বা বিদ্বেষভাব স্বভাবসিদ্ধ। অজয়-কুমার হরগোবিন্দ চৌধুরীর পুত্র জানিয়াও, ব্রজেন্দ্র প্রতি-শ্রুতি পালনার্থ এবং লৌকিক শিষ্টাচার রক্ষার জন্য পর দিবস অজয়কুমারের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। মনোমধ্যে তাঁহার বিদ্বেষভাব এবং প্রতিহিংসাবৃত্তি প্রবুদ্ধ থাকিলেও, অজয়ের বিনম্র শিষ্ট আচরণে তিনি মুগ্ধ হইলেন। যমুনার অলৌকিকী রূপপ্রভা, তীব্রদীপ্তি-বিস্ফারিত নেত্রশোভা পরি-লক্ষণে মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার হৃদয়মধ্যে এক অভাবনীয় পরি-বর্ত্তন সংঘটিত হইল। যমুনার আবেশময়ী সলাজদৃষ্টি হৃদয়ের বিদ্বেষবহ্নি নির্ব্বাপিত করিয়া তুলিল। ব্রজেন্দ্র হৃদয়মধ্যে যমুনার প্রেমময়ী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া বাড়ী ফিরিলেন।

আপন আলয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিবামাত্র অলকা ব্রজেন্দ্রের সম্মুখে আসিল। অলকা—যে অলকা ব্রজেন্দ্রের ভগ্নী—যে অলকা আকৈশোর একবৃন্তে প্রস্ফুটিত দুটী স্থলপদ্মের মত, তাহাদের ভগ্নকুটীর-প্রাঙ্গণে ফুটিয়াছিল, হরগোবিন্দ—যমুনার পিতা, তাহাদের মধ্যে যাহাকে তুলিয়া, যাহার চিরপবিত্র হৃদয়ে আবিলতার পঙ্ক ঢালিয়া, কালস্রোতে ভাসাইয়া দিয়াছে, সেই অলকা ব্রজেন্দ্রের সম্মুখে মলিনমুখে আসিয়া দাঁড়াইল। আর কি সে হৃদয়ে যমুনা তিষ্টিতে পারে? ব্রজেন্দ্র যমুনাকে

ভুলিলেন না—ভুলিলেন তাহার রূপমাধুরী, তাহার টানা টানা কর্ণ-বিশ্রান্ত বিলোল নেত্রের বিমল শোভা। যমুনা কে? তাঁহার ভগ্নীর—তাঁহাদের বংশের কলঙ্ককর্ত্তার দুহিতা।

বাড়ী ফিরিয়া, অলকাকে দেখিয়া, ব্রজেন্দ্রের মতপরিবর্ত্তন ঘটিল। হৃদয়মধ্যে প্রতিহিংসাবৃত্তি জাগিয়া উঠিল। হরগোবিন্দ হইতে তাঁহাদের বংশে যেমন কলঙ্ককালিমা পড়িয়াছে, তিনিও কি সেইরূপে তাহাদের বংশ কলঙ্কিত করিতে পারেন না? যমুনাকে ভালবাসার মোহে ভুলাইয়া, মূক বধির যুবতীর হৃদয়ে অতৃপ্ত বাসনার বিষবহ্নি প্রজ্বলিত করিয়া, সেই অনলে চৌধুরীবংশের সুখশান্তি, সুনাম কি ভস্মীভূত করিতে পারিবেন না? চেষ্টার অসাধ্য কার্য্য নাই। ব্রজেন্দ্র যমুনার সর্ব্বনাশসাধনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তাহার পর হইতে নিয়মিত প্রত্যহ তাঁহাদের বাটী যাতায়াত আরম্ভ করিলেন। যাতায়াতে হৃদ্যতা বাড়িল—যমুনা অসঙ্কোচে তাঁহার নিকট আসিতে লাগিলেন। অজয়ের সে বিষয়ে লক্ষ্য রহিল না। যমুনা ক্রমশঃ ব্রজেন্দ্রের রূপে মুগ্ধ হইতে লাগিলেন। অজয়ের অগোচরে অনেক সময়ে পরস্পরের মধ্যে লিপির আদান প্রদান চলিতে লাগিল।

রমণীহৃদয়ে একবার প্রণয় সঞ্চারিত হইলে, উত্তরোত্তর তাহার বৃদ্ধিই হইতে থাকে। প্রণয়ে রমণী দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্যা হয়—প্রণয়ে রমণী পাগলিনী হইয়া উঠে। প্রণয়পাত্রের জন্য স্ত্রীজাতি যতদূর আত্মত্যাগ, স্বার্থ বিসর্জ্জন করিতে পারে, পুরুষে ততদূর দেখা যায় না।

যমুনা প্রথম দর্শনেই ব্রজেন্দ্রকে হৃদয়ার্পণ করিয়া বসিল।

যমুনার হৃদয় বিভিন্ন উপাদানে গঠিত। পাঠক, ক্রমশঃ তাহার পরিচয় পাইবেন।

ইতিপূর্ব্বে আরও দুই তিনবার ব্রজেন্দ্রের সহিত তাহার গোপনে সাক্ষাৎ হইয়াছে। অট্টালিকা-সংলগ্ন উদ্যান-বাটীকায় অনেকবার তাহার সহিত মিলন ঘটিয়াছে। কিন্তু সে মিলনে পরস্পরের মনোভাব প্রকাশের তেমন সুযোগ ঘটিত না বলিয়া, অদ্য যমুনা গোপনে ব্রজেন্দ্রকে তাহার প্রকোষ্ঠমধ্যে আনিয়াছে।

যমুনা অনেকক্ষণ ব্রজেন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া, একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল। তাহার পর একখণ্ড কাগজে লিখিল, "আমি বড়ই অভাগিনী। হায়! আজ যদি আমার শ্রবণশক্তি থাকিত, তোমার মুখের একটীমাত্র প্রণয়সম্ভাষণ আমার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইলে, হৃদয়ে কত আনন্দ পাইতাম। আমি দুর্ভাগ্যবতী, তোমাকে মুখের কথায় সম্ভাষণ করিতে পারিব না—আমার ভালবাসায় তোমার কি মন উঠিবে?"

ব্রজেন্দ্র যমুনার লিখিত বিষয় পাঠ করিয়া, তাহার মুখপ্রতি প্রেমদৃষ্টি সঞ্চালিত করিয়া, একখণ্ড কাগজে লিখিয়া জানাইলেন, "সে কি যমুনা! তোমার ভালবাসায় আমার মন উঠিবে না? তুমি যে আমার সর্ব্বস্ব। তোমার শ্রবণশক্তি বা বাক্‌শক্তি থাকিলে, সত্য আমাদের সুখশান্তির পথ প্রসারিত হইত, কিন্তু তুমি মূক বধির বলিয়া কি আমি তোমায় ভালবাসিব না? তোমার দুর্ভাগ্যের জন্য বরং তোমার প্রতি আমার আসক্তি আরও বাড়িবে, আমি তোমায় আরও অধিক ভালবাসিব।"

যমুনা প্রণয়ীর লেখা পাঠ করিয়া, তাহার মুখের দিকে প্রেমপূর্ণ দৃষ্টি সঞ্চালিত করিল। তাহার বিশ্রান্ত নয়নপ্রান্তে

অশ্রুবিন্দু সঞ্চিত হইল। উজ্জ্বল দীপালোকে সে অশ্রুবিন্দু আরও উজ্জ্বল হইয়া জ্বলিতে লাগিল। ব্রজেন্দ্র যমুনাকে বাহু-মধ্যে ধরিয়া, তাহার নয়নপ্রান্তের অশ্রুবিন্দু মুছাইয়া দিলেন। যমুনার মাথা ব্রজেন্দ্রের বক্ষের উপর সংস্থিত হইল। যমুনা উভয়করে বদনাচ্ছাদন পূর্ব্বক কাঁদিতে লাগিল। যাহাকে ভালবাসিয়াছে--যাহাকে হৃদয়ার্পণ করিয়াছে, তাহার সহিত প্রাণ খুলিয়া কথাবার্ত্তা কহিতে পারিতেছে না বলিয়া, যমুনার এই দুঃখ, তাহার এই রোদনের কারণ।

ব্রজেন্দ্র রোরুদ্যমানা যমুনাকে আরও বক্ষের মধ্যে টানিয়া লইলেন। প্রণয়ে হৃদয় বিগলিত হয়। অনেক সময়ে প্রণয়ের অভিনয় করিতে গিয়াও মানবকে রূপের মোহজালে বিজড়িত হইতে হয়। যমুনার প্রতি ব্রজেন্দ্রের কিছুমাত্র ভালবাসা নাই। তাহাকে ভালবাসিয়া, তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়া, তাহাকে হৃদয়ে ধরিতে ব্রজেন্দ্র এখানে আসে নাই। তাহার ভালবাসা কৃত্রিমতাপূর্ণ। ব্রজেন্দ্র যমুনার সর্ব্বনাশ সাধিতে আসিয়াছে।

ব্রজেন্দ্র প্রণয়বিমুগ্ধা যমুনার অশ্রুসিক্ত গণ্ড যত্নের সহিত মুছাইয়া দিলেন। দীপালোকিত কক্ষমধ্যে পূর্ণযৌবনা যমুনাকে হৃদয়মধ্যে ধরিয়া, ব্রজেন্দ্র তাহার কম্পান্বিত অধরোষ্ঠে চুম্বন করিলেন। বিহ্বলা যমুনা আত্মবিস্মৃতার ন্যায় রসাবেশে মুগ্ধ হইয়া, প্রতারকের কোলে কিয়ৎক্ষণ নীরব রহিল, তাহার পর ধীরে ধীরে আপনাকে ব্রজেন্দ্রের বাহুবেষ্টন হইতে মুক্ত করিয়া উঠিয়া বসিল।

ব্রজেন্দ্রের হৃদয় স্বভাবতঃ উদার। যমুনার সহিত প্রতারণা করিতে তাহার হৃদয় ফাটিতে লাগিল। যমুনার পিতা তাহার

ভগ্নীর সর্ব্বনাশ করিয়াছে, সেই পাপে কি যমুনার সর্ব্বনাশ করা তাঁহার কর্ত্তব্য? ব্রজেন্দ্র মুহূর্ত্তের জন্য বিচলিত হইলেন।

যমুনা ব্রজেন্দ্রের স্কন্ধদেশে আপনার ভুজলতা সংস্থাপিত করিয়া ঊর্দ্ধে দক্ষিণকর উত্তোলন পূর্ব্বক—নীরব ভাষায় দেখাইল, "আমি আজি হইতে তোমার। তুমি আমার পতি, আমি তোমার পত্নী।"

ব্রজেন্দ্র পুনরায় তাহাকে বাহুবেষ্টনে ধরিয়া, তাহাকে বক্ষের উপর রাখিয়া, তাহার চক্ষের দিকে চাহিয়া, অঙ্গুলি সঙ্কেতে কহিলেন, "যমুনা! তুমি আমার—এ হৃদয় তোমা ভিন্ন কখন অন্য রমণীতে আসক্ত হইবে না।"

মুহূর্ত্তের জন্য ব্রজেন্দ্র যমুনার প্রতি বিদ্বেষভাব ভুলিয়া গেলেন। মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার মনে হইল, প্রকৃতই বুঝি তিনি তাহার ভালবাসায় মুগ্ধ হইলেন—তাহার রূপে আকৃষ্ট হইয়া প্রতিহিংসা ভুলিয়া গেলেন।

এই সময়ে কক্ষের বাহিরে কে দুইজন কথাবার্ত্তা কহিতেছে শুনিয়া, ব্রজেন্দ্র ইঙ্গিতে তদ্বিষয় যমুনাকে জ্ঞাত করিলেন। যমুনা ইঙ্গিতের অর্থ বুঝিয়া, ব্রজেন্দ্রকে নীরবে বসিয়া থাকিতে বলিল।

ব্রজেন্দ্র কণ্ঠস্বরে বুঝিলেন, বাহিরে কথোপকথনকারীর মধ্যে একজন অজয়কুমার, অপর সরসী—যমুনার সহচরী। অনিচ্ছাসত্ত্বেও ব্রজেন্দ্রকে তাঁহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতে হইল।

অজয়কুমার কহিলেন, "সরসী! অনেকদিন হইতে তোমার সহিত বিরলে সাক্ষাৎ করিবার জন্য ঘুরিতেছি, কিন্তু একদিনও সুযোগ ঘটিয়া উঠে নাই।"

সরসী লজ্জায় জড়সড় হইয়া, ধীরে ধীরে কহিল, "কেন আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ঘুরিতেছেন?"

অজয়। কেন! তুমি কি জাননা?

সরসী নীরব। কোন কথা কহিল না। অজয়কুমার পুনরায় কহিলেন, "সরসী, আমার যদি ভ্রম না হইয়া থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমি তোমাকে একাই ভালবাসি নাই, তোমারও ভালবাসা পাইয়াছি।"

সরসী। আমি আপনার বাড়ীর দাসী মাত্র। আমি আপনার মত লোকের ভালবাসার পাত্রী নই।

অজয়। যদি আমার হৃদয় অধিকার করিবার কাহারও শক্তি থাকে, তবে সে সরসীর। আমি তোমাকে হৃদয় দান করিয়াছি, তোমা ভিন্ন অন্য রমণীর মুখাবলোকন করিব না।

সরসী। আমা অপেক্ষা দরিদ্র কন্যার ইহা অপেক্ষা আর কি সৌভাগ্য হইতে পারে! কিন্তু এ বিবাহে আপনি বা আপনার আত্মীয় বন্ধুবান্ধব সুখী হইবেন না।

অজয়। কেন সরসী?

সরসী। আমার মত দরিদ্র কন্যা চৌধুরীগৃহের বধূ হইলে, তাঁহাদিগকে লজ্জায় মুখ নত করিতে হইবে।

অজয়। এই তোমার আপত্তি সরসী! কিসে আমার মুখোজ্জ্বল হইবে, কিসে আমার সুখশান্তি বাড়িবে, আমি তাহা ভালরূপ জানি।

সরসী। আপনার দিদি কিছুতেই সম্মতি দিবেন না।

অজয়। আমার দিদি আমার সুখের পথের কণ্টক হইবে না। সরসী, আমার দিদির মত দিদি যদি সকলের থাকিত,

তাহা হইলে ভগ্নীর স্নেহ যে কত শীতল, তাহা সহজেই বুঝিতে পারিত।

সরসী সে কথার কোন উত্তর করিল না। অজয় তাহাকে নীরব দেখিয়া কহিলেন, "আমি অবসর বুঝিয়া দিদিকে সকল কথা কহিব। আমার সহিত বিবাহে তোমার ত আর কোন অমত নাই?" এই কথা বলিয়া অজয় সরসীর কম্পিত হস্ত চাপিয়া ধরিলেন। সরসী এতক্ষণ বিনতদৃষ্টিতে দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছিল, এক্ষণে ধীরে ধীরে মাথা তুলিয়া, একবার অজয়ের মুখপ্রতি চাহিল। তাহার কথার কোন উত্তর না দিয়া, কুন্দদন্তে অধর চাপিয়া হাসিতে হাসিতে অজয়ের সম্মুখ হইতে বেগে প্রস্থান করিল।

ব্রজেন্দ্র ইঙ্গিতে যমুনাকে জানাইলেন, যাঁহারা বাহিরে কথা কহিতেছিলেন, চলিয়া গিয়াছে। রাত্রি অধিক হইয়াছিল, ব্রজেন্দ্র যমুনার নিকট বিদায় লইয়া উঠিলেন। যমুনা গোপন-পথে এইরূপ ভাবে আবার কাল আসিতে অনুনয় করিল। ব্রজেন্দ্র প্রতিশ্রুত হইয়া প্রস্থান করিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ

বনমধ্যে।

ব্রজেন্দ্র যখন বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন, তখন অলকা ঘুমাইয়াছে, তিনি আর তাহাকে জাগরিত করিলেন না। সত্বর আহারাদি সমাপন করিয়া, আপনার শয়ন কক্ষে প্রস্থান করিলেন। উপাধান-নিম্ন হইতে একখানি কিরিচ বাহির করিয়া বস্ত্রমধ্যে গোপন করিলেন। ধীরহস্তে কক্ষদ্বার রুদ্ধ করিয়া নিঃশব্দে নীচে নামিয়া আসিলেন এবং বাটীর ভৃত্যাদি কাহাকেও জাগরিত না করিয়া, স্বয়ং অশ্বশালে গমন পূর্ব্বক, একটী অশ্ব সজ্জিত করিয়া, তাহাতে আরোহণ করিলেন। অশ্ব বনাভিমুখে চলিল।

ব্রজেন্দ্রকুমার শৈলপুর উত্তীর্ণ হইয়া, অশ্ব দ্রুত ছুটাইয়া দিলেন; রাত্রি যখন দ্বিতীয় প্রহর, তখন নির্দ্দিষ্ট বনমধ্যে উপস্থিত হইলেন। গুপ্তস্থান হইতে দস্যুপ্রদত্ত ধনরত্নাদি বাহির করিয়া, একটী থলের মধ্যে পুরিলেন। থলেটী অশ্বপৃষ্ঠে স্থাপন পূর্ব্বক, অশ্বে আরোহণ করিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে এক বিকটাকার মূর্ত্তি তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। কদাকার কৃষ্ণবর্ণ আকৃতি। কটিদেশে অৰ্দ্ধমলিন এক বসন,

মস্তকে লালবর্ণের একটা পাগড়ি—তাহার আস পাশ দিয়া তৈলসংস্পর্শশূন্য সুদীর্ঘ কেশরাশির কিয়দংশ স্কন্ধ ও পৃষ্ঠের উপর লম্বিত হইয়া পড়িয়াছে। হস্তে এক সুদীর্ঘ যষ্টি।

ব্রজেন্দ্র এ বনে অনেকবার আসিয়াছেন, কিন্তু ইহার পূর্ব্বে অন্য কোন লোকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় নাই। অদ্য কৃতান্তকিঙ্কর দস্যুকে সহসা সম্মুখে উপস্থিত হইতে দেখিয়া, তিনি চমকিয়া উঠিলেন। ব্রজেন্দ্র কোন কথা কহিবার পূর্ব্বেই দস্যু সযষ্টি দক্ষিণহস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক বজ্রকর্কশস্বরে কহিল, "দাঁড়া, ঘোড়ায় উঠিস্ না। তোর থলেতে কি আছে দে।"

ব্রজেন্দ্র ভীত না হইয়া, ব্যঙ্গস্বরে কহিল, "কে বলিল, আমার থলেতে কিছু আছে?"

দস্যু। আমি বলিতেছি। আমি এখানে অনেকক্ষণ আসিয়াছি। লুকাইয়া তোর সব কাজ দেখিতেছি। এখন প্রাণ চাস, কি টাকা চাস, বল?

ব্রজেন্দ্র। প্রাণই চাই—টাকায় আমার আবশ্যক নাই।

দস্যু। তবে টাকার থলেটা এইখানে নামাইয়া দে। তোকে প্রাণে মারিব না।

ব্রজেন্দ্র। দিতেছি, কিন্তু আমায় আর কিছু বলিবে না ত?

ব্রজেন্দ্রের ভীরুতা দেখিয়া দস্যু হাসিল। দক্ষিণকর নামাইয়া কহিল, "না, সত্য বলিতেছি, তোর আর কোন অনিষ্ট করিব না।"

ব্রজেন্দ্র অশ্বপৃষ্ঠ হইতে মুদ্রাপূর্ণ থলিয়াটী লইয়া দস্যুর সম্মুখে নিক্ষেপ করিল। দস্যু টাকার তোড়াটী তুলিবার জন্য যেমন হেঁট হইল, অমনি ব্রজেন্দ্র বিদ্যুত্গতিতে বস্ত্রাভ্যন্তরে

গুপ্ত শাণিত কিরিচখানি বাহির করিয়া, তাহার পৃষ্ঠদেশে আমূল বিদ্ধ করিয়া দিলেন। দস্যু চিৎকার করিয়া, ভূতলে পতিত হইল।

গভীর অরণ্যানির নৈশ নিস্তব্ধতার মধ্যে দস্যুর আর্ত্তনাদ প্রতিধ্বনিত হইল। তাহার স্বাভাবিক বিকট মুখাকৃতি মৃত্যু-চ্ছায়ায় সমাচ্ছন্ন হইয়া, আরও বিকটাকার ধারণ করিল। দেখিতে দেখিতে তাহার প্রাণান্ত ঘটিল। বহু বিস্তৃত নীরব নিস্তব্ধ বনস্থলী—চন্দ্রকরে কোথাও ঈষদালোকিত, কোথাও ঘোরান্ধকার। বৃক্ষতলে দস্যুর রক্তাক্ত মৃতদেহ—মৃতদেহের মুখে পল্লবান্তরালবাহী চন্দ্রকর পড়িতেছে, নৈশ মন্দ পবনা-ন্দোলনে বৃক্ষের শাখাপল্লব কাঁপিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে শবমুখে প্রপতিত আলোকরশ্মিও কাঁপিতেছে—ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হই-তেছে। ব্রজেন্দ্র তৎপ্রতি চাহিয়া থাকিতে থাকিতে শিহরিয়া উঠিলেন। হস্তস্থ নররক্ত-কলঙ্কিত কিরিচখানা দূরে নিক্ষেপ করিয়া, লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক অশ্বারোহণ করিলেন। টাকার তোড়া দস্যুর পার্শ্বে পড়িয়া রহিল, তিনি অশ্বকে কশাঘাত করিয়া. বেগে বনভূভাগ হইতে বহির্গত হইয়া পড়িলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

হত্যা।

ব্রজেন্দ্র যখন শৈলপুরের উপকণ্ঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন নিশি প্রায় প্রভাত। পূর্ব্বদিকে উষার ক্ষীণালোক অস্পষ্ট পরিলক্ষিত হইতেছে। সেই অস্পষ্টালোকে ব্রজেন্দ্র দেখিলেন, তাহার পরিধেয় বসনের কয়েক স্থানে রক্তচিহ্ন। নিকটবর্ত্তী সরিত্তীরে অশ্ব হইতে অবতরণ পূর্ব্বক এক বৃক্ষ-কাণ্ডে অশ্ববন্ধন করিলেন। তাহার পর জলে নামিয়া যত্নসহ-কারে রক্তরক্ষিত স্থান কয়টী পরিষ্কার পূর্ব্বক পুনরায় অশ্বারোহণে বাটীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তখনও বাটীর কেহ প্রবুদ্ধ হয় নাই। নিঃশব্দে অশ্বশালে গমন করিয়া অশ্ববন্ধন করিলেন। অশ্বশালার পরেই তাঁহার উদ্যানবাটিকা। উপবনের মধ্য দিয়া অন্দরপথে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে অশ্রুসিক্তা ম্লানমুখী অলকা ছুটিয়া তাঁহার সম্মুখে আসিল এবং উভয়করে ব্রজেন্দ্রের যুগলকর ধারণ করিয়া কাতরকণ্ঠে কহিল, "তুমি সমস্ত রাত্রি কোথায় ছিলে? আমায় কি একবারও কোন কথা বলিয়া যাইতে নাই! সমস্ত রাত্রি আমি কাঁদিয়া কাটাইয়াছি।"

ব্রজেন্দ্র স্নেহমাখাস্বরে কহিলেন, "আমি একটু ঠাণ্ডা হই, তোমাকে সকল কথা বলিব। এখন তুমি বাগানে বেড়াও, আমি শীঘ্র কাপড় ছাড়িয়া তোমার নিকট আসিতেছি।" এই কথা বলিয়া ব্রজেন্দ্র ভগ্নীর মুখপানে সস্নেহ দৃষ্টি সঞ্চালন পূর্ব্বক বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। অলকা কিয়ৎক্ষণ ক্ষুণ্নমনে সেই স্থানে দণ্ডায়মান রহিল। বস্ত্রাঞ্চলে গণ্ডবাহী গলিতাশ্রুধারা মুছিয়া পশ্চাৎ ফিরিল। কিন্তু এ কি! পশ্চাতে ও কে? অলকা শিহরিয়া উঠিল। ভুবনেশ্বরী মন্দিরের সেই [illegible] মূর্ত্তি! সেই গর্ব্বিতাননা—সেই রোষকষায়িতলোচনা রমণী নিঃশব্দ পদসঞ্চারে কখন আসিয়া তাহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া আছে। অলকা তাহার রোষদীপ্ত তীব্রকটাক্ষ অক্ষির সমক্ষে ভয়বিহ্বলা হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সর্ব্বশরীর কম্পিত হইল, শুষ্ক ওষ্ঠাধর নড়িল, কিন্তু মুখে বাঙ্নিষ্পত্তি হইল না। রমণী অলকার দিকে মুহূর্ত্তের জন্য নির্নিমেষ-নয়নে চাহিয়া রহিল—কি কর্ত্তব্য মুহূর্ত্তের জন্য যেন ভাবিল। উজ্জ্বল [illegible] আয়ত নয়ন আরও আয়ত হইল। ঈষৎ বর্ত্তুল, [illegible] অধর কুন্দদন্তে চাপিয়া, রমণী বক্ষঃস্থল হইতে [illegible] মৃত্যুজিহ্বা সদৃশ এক ভীষণ ছুরিকা সহসা বাহির করিয়া, অলকার সমক্ষে ধরিল। ঊষার অস্পষ্টালোকে অলকা দেখিল, ছুরিকা ঊর্দ্ধে উঠিল। অলকা চীৎকার করিতে [illegible]-পারিল না। যুক্তকরে ক্ষমা ভিক্ষা চাহিল—অনেক কষ্টে কম্পিতকণ্ঠে কম্পিত ওষ্ঠাধর হইতে অস্পষ্ট নির্গত হইল, "ক্ষমা—দয়া—"

রমণী কিন্তু পদানতা শত্রুকে ক্ষমা করিল না। বিদ্যুৎবেগে

ভীষণ ছুরি আসিয়া অলকার বক্ষে পতিত হইল। ছুরিকাগ্র-ভাগ হৃৎপিণ্ড স্পর্শ করিল। অলকার মুখে আর বাক্যক্ষ নির্গত হইল না। কর্ত্তিতমূল নিরাবলম্বন লতিকার ন্যায় অলকার অবসন্নদেহ শত্রুপদতলে নিপতিত হইল। দুর্ব্বৃত্ত ছুরিকাখানি অলকার বক্ষ হইতে তুলিয়া লইয়া, তাহারই বস্ত্রে বেশ করিয়া মুছিল। মুদিতনয়না রক্তাক্তকলেবরা অলকার পানে আর একবার চাহিয়া, দুর্ব্বৃত্ত নিমিষের মধ্যে উপবনের নিবিড়পত্র বৃক্ষশ্রেণীর ভিতর কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল।

এই সময়ে বাহিরে বহুলোকের দ্রুত পদশব্দ শ্রুত হইল। গলদঘর্ম্ম কলেবরে চারিজন ছুটিয়া আসিয়া, সহসা রাজেন্দ্রের উপবনের পার্শ্বস্থ পথে দণ্ডায়মান হইল। তাহারা কাহার অনুসরণ করিতেছিল, কিন্তু অকস্মাৎ লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়াতে, কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া, বজ্রাহতের ন্যায় দণ্ডায়মান হইল। তাহাদের মধ্যে একজন কহিল, "আমি তাহাকে এই পথে ছুটিয়া আসিতে দেখিয়াছি।" অপর কহিল, "আমিও দেখিয়াছি, তাহার উপর আমার নজর বরাবর ছিল। কিন্তু এইখানে আসিয়া কোথায় মিলাইয়া গেল।"

প্রত্যুত্তরে প্রথম কহিল, "তারাচাঁদ বড় সহজ লোক নয়— তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে পারিলে আজ দেশের অশান্তি নষ্ট হইত।"

তৃতীয় ব্যক্তি কহিল, "আমার বোধ হয় সে এই বাগানের মধ্যে লুকাইয়াছে। একবার দেখিতে আপত্তি কি ?"

এ কথা সকলেরই মনে লাগিল। কুজ্ঝটিকার নিবিড়পত্র লতাবিতানবেষ্টিত ফুলগাছের মধ্যে ঊষার অন্ধকারে তারাচাঁদ

দস্যুর আত্মগোপন অসম্ভব নয়। তৎক্ষণাৎ চারিজন পাইক বাগানের বেড়া ডিঙ্গাইয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিল। তন্ন তন্ন করিয়া প্রত্যেক স্থান অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিল, কোন স্থানে তারাচাঁদের সন্ধান পাইল না। অবশেষে যে স্থানে শোণিতহ্রদে ভাসমানা প্রফুল্ল পঙ্কজিনীর ন্যায়, রক্তাক্তা অলকার গতায়ুদেহ নিপতিত, সেই স্থানে উপনীত হইল ভয়ে বিস্ময়ে চীৎকার করিয়া পুরবর্ত্তী ব্যক্তি কহিল, "একি!"

পাইক কয়জন ধরাধরি করিয়া অলকাকে তুলিল। বক্ষের বসন অপসৃত করিয়া দেখিল, তখনও বক্ষস্থ গভীর ক্ষত হইতে ঈষদুষ্ণ শোণিতস্রাব হইতেছে। তাহাদের ধারণা জন্মিল, এ কার্য্য তারাচাঁদের। পাষণ্ড এখানে উপস্থিত হইয়াছিল, সম্মুখে এই রমণীকে দেখিয়া, পাছে সে ভয়ে চীৎকার করে, ভাবিয়া তাহাকে হত্যা করিয়াছে। তাহারা পুনরায় তারাচাঁদের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল।

রক্ষীচতুষ্টয় কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া দেখিল, অন্তঃপুর প্রবেশ দ্বার উন্মুক্ত রহিয়াছে। বাটীর মধ্যে তারাচাঁদের প্রবেশ অসম্ভব নয়। তাহারা বিনা সঙ্কোচে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। দুই জন নিম্নতলের প্রকোষ্ঠাদি পরীক্ষা করিতে লাগিল, অপর দুই জন দ্বিতলে উঠিয়া গেল। সোপানাতিক্রম করিয়াই দ্বিতলের একটী কক্ষদ্বার ঈষৎ মুক্ত দেখিয়া, তাহার মধ্যে প্রবেশ করিল। এটী ব্রজেন্দ্রের শয়নকক্ষ। ব্রজেন্দ্র সবে মাত্র গৃহ প্রবেশ করিয়া, বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিতেছেন; সহসা শান্তিরক্ষক ফৌজদারের পাইকদ্বয়কে দেখিয়া চমকিত ও ভীত হইলেন। মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার

মুখে বাঙ্‌নিষ্পত্তি হইল না। পাইকদ্বয় তাঁহাকে বিনীতভাবে অভিবাদন করিয়া কহিল, "মহাশয়কে একবার বাহিরে আসিতে হইবে।"

ব্রজেন্দ্র। কেন?

পাইক। আপনার উদ্যান মধ্যে একটী নরহত্যা হইয়াছে—হন্তা সম্ভবতঃ আপনার বাটীর মধ্যে এখন আছে।

ব্রজেন্দ্র। খুন্—আমার উদ্যানমধ্যে হত্যা! অলকা, অলকা! বাধা দিয়া পাইক জিজ্ঞাসিল, "কে অলকা?"

ব্রজেন্দ্র। আমার—আমার আত্মীয়া কোন স্ত্রীলোক।

পাইকদ্বয় পরস্পর মুখের দিকে চাহিল। ব্রজেন্দ্র কম্পিত-হৃদয়ে শুষ্ককণ্ঠে ভগ্নস্বরে কহিল, "চল, কোথায় দেখিব!"

সকলে বাহির হইতেছিল, এমন সময়ে একজন পাইকের দৃষ্টি ব্রজেন্দ্রের পরিত্যক্ত বসনের উপর পড়িল। বস্ত্রের স্থানে স্থানে রক্তের মত কিসের চিহ্ন। পাইকদ্বয় পুনরায় দৃষ্টিবিনিময় করিল। একজন সাহস সহকারে বস্ত্রখানি তুলিয়া, বাহিরে আনিয়া দেখিল, প্রকৃতই বসনের স্থানে স্থানে রক্তচিহ্ন এবং স্থানে স্থানে আর্দ্র। লক্ষ্য করিয়া দেখিলে, তাহার মধ্যেও শোণিতবিন্দুর নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়।

রক্ষী যখন বস্ত্র গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইতেছিল, তখন ব্রজেন্দ্র বাধা দিয়াছিলেন, কিন্তু রক্ষী তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিল না। সহসা ব্রজেন্দ্রের মনে আর এক ভয় সঞ্চার হইল। বুঝি বা তাঁহাকেই অলকার হত্যাপরাধে অভিযুক্ত হইতে হয়। আত্মদোষ ক্ষালনের কি কোন উপায় নাই?

পাইক দুই জন তাঁহার মুখের দিকে চাহিল তিনি

নীরব। এই সময়ে নিম্নতলে অনুসন্ধান করিয়া অপর পাইক-দ্বয়ও তাহাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল এবং সকল বৃত্তান্ত অবগত হইল।

প্রথম রক্ষক কহিল, "আপনার বস্ত্রে এ কিসের দাগ?"

ব্রজেন্দ্র উত্তর করিলেন না। পুনরায় রক্ষক জিজ্ঞাসিল, "আপনি কি অলকাকে হত্যা করিয়াছেন?"

ব্রজেন্দ্র দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "না।"

রক্ষী। তবে আপনার বস্ত্রে রক্তের দাগ কোথা হইতে লাগিল? বস্ত্রে আরও রক্ত লাগিয়াছিল, আপনি ধুইয়া ফেলিয়াছেন, কিন্তু অল্প অল্প দাগ রহিয়াছে।

ব্রজেন্দ্র। সত্য। কিন্তু অলকার রক্ত নয়।

প্রহরী। তবে কাহার?

ব্রজেন্দ্র। উপস্থিত হত্যাব্যাপারের সহিত তাহার কোন সংস্রব নাই।

প্রহরী। তারাচাঁদ দস্যুকে চেনেন?

ব্রজেন্দ্র নাম শুনিয়াছি। দেখি নাই।

প্রহরী। আপনাকে আমরা গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যাইব।

ব্রজেন্দ্র। কেন?

প্রহরী। অলকার হত্যাপরাধে আপনিই দোষী।

ব্রজেন্দ্র পূর্ব্ব হইতেই এ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, সুতরাং প্রহরীর কথায় বিচলিত হইলেন না। গম্ভীরস্বরে কহিলেন, "আমার অদৃষ্টের দোষ। তোমরা তোমাদের কর্ত্তব্য পালন করিতে পার।"

একজন পাইক রক্তচিহ্নিত সন্দিগ্ধ বস্ত্রাদি এবং অপর দুই

জন ব্রজেন্দ্রকে লইয়া ফৌজদারের নিকট চলিয়া গেল। অপর মৃতদেহের নিকট রহিল।

শৈলপুর যে সুবার অন্তর্গত, সেই সুবার ফৌজদার তখন নন্দীগ্রামে বাস করিতেছিলেন। শৈলপুর এবং নন্দীগ্রামের মধ্যে ব্যবধান সামান্য—কয়েক বিঘা জমিমাত্র। ব্রজেন্দ্র ফৌজদারের আদেশে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন। ভবিতব্য কে নিবারণ করিতে সমর্থ হয়!

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

কারাগারে।

ব্রজেন্দ্রের দিন আর কাটিতেছে না। কারাগারের অন্ধতম প্রদেশে আবর্জ্জনাপূর্ণ ভূশয্যায় শুইয়া হতভাগ্য ব্রজেন্দ্র অশ্রুপ্লাবনে কারামৃত্তিকা অভিসিক্ত করিতেছেন। আত্মরক্ষার্থ দস্যুরক্তে হস্ত কলঙ্কিত করিয়াছিলেন, নতুবা জীবনে কখন কাহারও প্রাণের হিংসা করেন নাই। অলকা-হত্যায় তিনি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ। তবে কেন এমন হইল? রুদ্ধদ্বার আলোক-সমাগম-শূন্য কারাকক্ষে শুইয়া ব্রজেন্দ্র ভাবিতেছেন, তবে কেন এমন হইল? আত্মরক্ষার্থ দস্যুর জীবন লইয়াছি। সেই পাপেই কি আমাকে আজ কারাযন্ত্রণা ভুগিতে হইল? তবে কি আত্মরক্ষা মহাপাপ? কিছুরই মীমাংসা হইল না। ব্রজেন্দ্র যেমন পড়িয়াছিলেন, তেমনি পড়িয়া রহিলেন। অভাগিনী অলকার জন্য তাঁহার শোকাবেগ উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। ছয় বৎসরের পর অলকার সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন কিন্তু মাসত্রয় অতীত হইতে না হইতে বিধাতা তাহাকে আবার কাড়িয়া লইলেন। ইহজীবনে আর তাহার সাক্ষাৎ পাইবেন না। অলকা মরিল। তাহার অদৃষ্টে যদি অপঘাত মৃত্যুই ছিল—

অকালে সংসার-কানন হইতে তাহাকে ছিঁড়িয়া ফেলাই যদি জগৎস্রষ্টার মনের বাসনা ছিল, তবে তাহাকে ফুটিতে দিয়া—তাহার ফুটন্ত যৌবনে কলঙ্কের কালিমা ঢালিয়া দিয়া—তাহাকে এমন করিয়া সংসার হইতে কেন অপসৃত করিলেন। অলকা কলঙ্কিনী হইবার পূর্ব্বে কেন মরিল না?

দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা হইল। বাহিরে অনন্তাকাশে অনন্ত নক্ষত্র ফুটিয়া উঠিল। স্ফুট চন্দ্রালোকে জল, স্থল গগন সকলই হাসিতে লাগিল। হাসিল না কেবল ভাগ্যনিপীড়িত ব্রজেন্দ্র। রজনী সমাগমে ভীষণ কারাগার আরও ভীষণ হইল। তাহার মধ্যে অন্ধকার জমাট বাঁধিয়া, ব্রজেন্দ্রের আসে পাশে আরও ঘনীভূত হইতে লাগিল। ব্রজেন্দ্র সেই নিবিড়ান্ধকার নিঃশব্দ নীরব কারাকক্ষে মৃতবৎ পড়িয়া আছেন। সহসা কারাগার বাহিরে কাহার পদশব্দ হইল। ব্রজেন্দ্র উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিলেন। পদশব্দ ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী। কারাগারের লৌহশৃঙ্খল ঝন্ ঝন্ শব্দে খুলিয়া পড়িল। ব্রজেন্দ্র উঠিয়া বসিলেন। অকস্মাৎ কারাদ্বার উন্মুক্ত হইল। কারাধ্যক্ষ আলোকহস্তে কারাগার মধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিলেন, "তোমার বন্ধু তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন, অধিকক্ষণ সময় দিতে পারিব না—শীঘ্র কথাবার্ত্তা কহিয়া লও।" এই কথা বলিয়া, আলোকটী গৃহমধ্যে এক স্থানে রাখিয়া, দ্বারের নিকট হইতে কিঞ্চিৎ সরিয়া দাঁড়াইলেন। বন্ধু এতক্ষণ কারাধ্যক্ষের পশ্চাতে ছিলেন, গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

ব্রজেন্দ্র নির্ব্বাক, বিস্ময়ে বাক্‌শক্তিবিহীন। শৈলপুরে এমন

বন্ধু, এমন আত্মীয় কে আছে যে, তাঁহার বিপদে ব্যথা পাইয়া, কারাগারে তাঁহার বিষাদখিন্নহৃদয়ে শান্তিবারি ঢালিতে আসিবে? শৈলপুরে কেন, জগতে তাঁহার কেহ আত্মীয় নাই। তবে এ বন্ধু কে?

ব্রজেন্দ্র বিস্ময়স্তিমিত নয়নে কারাধ্যক্ষের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, তাঁহার মুখে কোন কথা বাহির হইল না। কারাধ্যক্ষ অজাতশ্মশ্রু একটী সুন্দর যুবককে কারাগারের মধ্যে রাখিয়া, দ্বার শৃঙ্খলারুদ্ধ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

যুবককে দেখিবামাত্র ব্রজেন্দ্র চিনিলেন। তাঁহার শিরায় শিরায় শোণিতপ্রবাহ তড়িদ্বেগে প্রবাহিত হইল। মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু এও কি সম্ভব! সচরাচর পুরুষের যেখানে প্রবেশ করা কষ্টসাধ্য—সে স্থলে রমণী—কুলের কুলবতী, মূক বধির কিশোরী কেমন করিয়া প্রবেশ লাভ করিল! ছদ্মবেশে পুরুষের বেশ ধরিয়া যমুনা কারাগারে! মুহূর্ত্তের জন্য ব্রজেন্দ্র স্তম্ভিত, বিস্মিত। মুহূর্ত্তের মধ্যে তাঁহার হৃদয়ে এক বিষম বিপ্লব উপস্থিত হইল। যমুনা কারাগারে কেন? যমুনা তাঁহাকে ভালবাসিয়াছে—তাঁহার প্রণয়ে উন্মত্তা হইয়াছে, তাঁহার বিপদে হৃদয়ে ব্যথা পাইয়াছে, তাই উন্মাদিনীবৎ কুলমানের ভয় বিসর্জ্জন দিয়া, তাঁহার নিকট ছুটিয়া আসিয়াছে। এরূপ প্রেমবিমূঢ়া সরলার সহিত তাঁহার প্রতারণা-খেলা কি ভাল? যে তাঁহার জন্য বিহ্বলা, তাহার সর্ব্বনাশ করিলে ঈশ্বর কি তাঁহার ভাল করিবেন? যমুনার দোষ কি? তাহার পিতা সহস্র অপরাধে অপরাধী হইতে পারে তাহার পিতা নরকের কৃমিকীট—নররাক্ষস হইতে পারে,

সেই অপরাধে কি যমুনাকে দণ্ডিত করা—তাহার সর্ব্বনাশ করা কোন হৃদয়বান মানবের উচিত? সর্ব্বপ্রথমে এই কারাগারে দণ্ডায়মান হইয়া, ব্রজেন্দ্রের মনে এই ভাবের উদয় হইল, এমন নহে। পূর্ব্বে অনেকবার এ প্রকার চিন্তা তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হইয়াছিল, কিন্তু মোহান্ধকারে হৃদয়নিহিত বিবেকবুদ্ধি সমাচ্ছাদিত থাকাতে, তাহার বিকাশ প্রাপ্ত হয় নাই। এক্ষণে কারাকক্ষ মধ্যে যমুনাকে সমুপস্থিতা দেখিয়া, তিনি তাহার পিতার সমস্ত দোষ ভুলিয়া গেলেন, তাহার ভালবাসায় মুগ্ধ হইয়া, প্রেমের সিংহাসন নিম্নে হৃদয়ের প্রতিহিংসাবৃত্তিকে বলি দিলেন।

যমুনারই জয় হইল। ব্রজেন্দ্র হারিলেন। অকপটহৃদয়ে যাহাকে সাধনা করা যায়, নিশ্চয়ই তাহা সুদুর্ল্লভ হয় না। প্রাণান্ত সাধনার ফলে যমুনা আজি ব্রজেন্দ্রের হিংসাকলুষিত হৃদয়মাঝে প্রেমের সিংহাসন পাতিতে সমর্থ হইল।

নিমেষমধ্যে ব্রজেন্দ্রের হৃদয়ে একখানি বিপ্লব ঘটিল। তিনি যমুনাকে বাহুপাশে ধরিবার জন্ত তাহার নিকট ছুটিয়া গেলেন। যমুনা কিন্তু কয়েকপদ পশ্চাতে হটিয়া দাঁড়াইল এবং বস্ত্রমধ্য হইতে একখণ্ড কাগজ বাহির করিয়া, তাঁহার হাতে দিল। তাহাতে লেখা ছিল,—"ঈশ্বরের দিব্য সত্য করিয়া বলিবে, অলকা কি তোমার উপপত্নী?"

পাঠ করিয়া ব্রজেন্দ্র বুঝিলেন, যমুনা কেন তাঁহার আলিঙ্গনমধ্যে ছুটিয়া না আসিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। তিনি ঊর্দ্ধে হস্তোত্তলনপূর্ব্বক ইঙ্গিতে কহিলেন, "সর্ব্বস্রষ্টা ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া বলিতেছি, তোমার সন্দেহ অমূলক।"

ব্রজেন্দ্রের ইঙ্গিতের অর্থ যমুনা বুঝিল। তাঁহার কথায় তাহার বিশ্বাস হইল, যমুনা ব্রজেন্দ্রের গলা ধরিয়া, তাঁহার বক্ষে মাথা রাখিয়া, ক্ষুদ্র বালিকার ন্যায় রোদন করিতে লাগিল। যমুনার রোদনে ব্রজেন্দ্রের চক্ষেও জল আসিল। তিনি অশ্রুসিক্ত অক্ষি চুম্বন করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "যমুনা! তোমার কি বিশ্বাস, আমি খুন করিয়াছি?" যমুনা হস্তাঙ্গিতে তাঁহার নির্দ্দোষিতার পোষকতা করিল এবং তাঁহার উপর যে তাহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে, তাহাও জানাইল। যমুনা সঙ্গে লিখিবার উপকরণ আনিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা লিখিয়া জানাইল, "তুমি যে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ, তাহা জানি। আমি সমস্ত অবগত হইয়াছি। তুমি এখান হইতে পলায়ন কর—টাকায় সব হয়—টাকা খরচ করিলে তোমার জন্য কারাগারের দ্বার মুক্ত হইবে।"

ব্রজেন্দ্র মস্তক সঞ্চালন করিয়া অসম্মতি জানাইলেন। যমুনা পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিল। ব্রজেন্দ্র কাগজে লিখিলেন, আমি দুইটী কারণে পলাইব না। প্রথমতঃ আমি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী। কারাগার হইতে কোনরূপে পলায়ন করিতে সক্ষম হইলেও, আমার এ কলঙ্ক চিরদিন থাকিবে। আমাকে প্রকৃত দোষীর ন্যায় আত্মগোপন করিয়া থাকিতে হইবে। ভগবানের রাজত্বে নিরপরাধ ব্যক্তি কখনও দণ্ডিত হয় না। দ্বিতীয়তঃ পলাইলে, আমাকে তোমার আশা ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে। আমি তোমাকে জীবনে আর দেখিতে পাইব না। না—আমি পলাইব না!

যমুনা বিষণ্ণা হইল। তাহার গণ্ড বহিয়া দরবিগলিত ধারা বহিতে লাগিল। ব্রজেন্দ্র পুনরায় জানাইলেন, "ন্যায়বান

পরমেশ্বরের রাজত্বে অবিচার নাই। তাঁহার দয়ার উপর নির্ভর করিয়া, বিচার-ফলের অপেক্ষা কর। আমার নির্দ্দোষিতা নিশ্চয়ই প্রমাণিত হইবে। আমরা আবার মিলিত হইতে পারিব।"

যমুনা লিখিল, "বিচারফল অনিশ্চিত। অনিশ্চিতের উপর নির্ভর করিয়া আত্মজীবন বিপন্ন করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। তুমি পলায়নে স্বীকৃত হও—তোমার উদ্ধারের জন্য যত টাকার আবশ্যক, আমি খরচ করিব।"

ব্রজেন্দ্র যমুনার প্রণয়ের প্রখরতা বুঝিয়া বিমুগ্ধ হইলেন এবং তাহার প্রতি এতদিন কপটাচরণ করিয়াছিলেন ভাবিয়া, মর্ম্মাহত হইলেন। অবশেষে যমুনার নির্ব্বন্ধাতিশয্য দর্শনে কহিলেন, "পলাইতে পারি, যদি তোমাকে ছাড়িতে না হয়। তুমি কি আমার সহিত যাইবে?"

যমুনা ব্রজেন্দ্রের মুখপ্রতি চাহিয়া রোদন করিতে লাগিল। তাহার হৃদয় বিভিন্ন হইবার উপক্রম হইল। প্রণয়োন্মাদিনী যমুনা কি ব্রজেন্দ্রের জন্য এতদূর করিবে? যমুনা সকলই পারে, কিন্তু তাহার পলায়নে আর একজনের জীবনের সুখ-শান্তির মূলে কুঠারাঘাত পড়িবে। তাহার জীবনের মহৎ সুদুরূহ ব্রত অনুদ্যাপিত রহিবে। ব্রজেন্দ্রের সহিত মিলনে তাহার সুখ, কিন্তু তাহার নিজের সুখশান্তি অপেক্ষা যাহার— যে অজয়ের সুখশান্তি তাহার নিকট অধিক মূল্যবান, যাহার জীবনের সুখশান্তিবিধান তাহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য, একমাত্র মহাব্রত, তাহা পড়িয়া রহিবে। যমুনা আপনার সুখশান্তিকে শতবার পদতলে দলিত করিতে পারে কিন্তু

অজয়ের প্রাণে প্রাণ থাকিতে অশান্তির ছায়ামাত্র স্পর্শ হইতে দিবে না। এই দুঃখে যমুনার চক্ষে জল আসিল। যমুনা ব্রজেন্দ্রের গলদেশে আপনার কমনীয় বাহুলতিকা স্থাপনপূর্ব্বক অধোবদনে নীরবে রোদন করিতে লাগিল। যমুনার দুঃখে ব্রজেন্দ্রের নয়নেও জল আসিল। ব্রজেন্দ্র তাহাকে অকপটে হৃদয়ে ধরিয়া, তাহার অশ্রুসিক্ত ম্লানমুখ মুছাইয়া দিলেন।

এই সময়ে বাহিরে পদশব্দ ও লৌহশৃঙ্খল পতনের ঝন্ ঝন শব্দ শুনিয়া, ব্রজেন্দ্র ইঙ্গিতে যমুনাকে কারাধ্যক্ষের আগমন সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। যমুনা একপার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইল।

কারাধ্যক্ষ কারাগারের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন, "আমি আর অপেক্ষা করিতে পারি না।" এই বলিয়া আলোকটা তুলিয়া লইলেন। যমুনা স্নেহশীল বন্ধুর ন্যায় ব্রজেন্দ্রকে কোমলালিঙ্গন পাশে বদ্ধ করিয়া বিদায় লইল। পুনর্ব্বার কারাগার লৌহশৃঙ্খলাবদ্ধ হইল।

ব্রজেন্দ্র রুদ্ধদ্বার গভীরান্ধকার কারামধ্যে বসিয়া যমুনার অপরিমেয় ভালবাসার বিষয় পরিচিন্তন করিতে লাগিলেন। এরূপ প্রেমময়ী তদ্গতপ্রাণা সরলার প্রতি কৃত্রিমতা প্রকাশ পূর্ব্বক তাহাকে কলঙ্কিনী করিতে হৃদয়ে কুভাবের পোষণ করিয়াছিলেন বলিয়াই, পরমেশ্বর তাঁহাকে এইরূপ বিপজ্জালে বিজড়িত করিয়াছেন, এক্ষণে তাঁহার মনে এইরূপ ধারণা জন্মিল। তিনি জীবন দিয়াও যমুনার ভালবাসার প্রতিদান করিতে মনস্থ করিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

তারাসর্দ্দার।

তারা-সর্দ্দারের পূরা নাম তারাচাঁদ মণ্ডল। তাহার আদি নিবাস শৈলপুরের নিকটবর্ত্তী একটী গণ্ডগ্রামে। তারাচাঁদ বাল্যকাল হইতেই উদ্ধতস্বভাব। প্রথম বয়সে কিছু লেখা-পড়াও শিখিয়াছিল। যৌবনে অসৎসঙ্গে মিশিয়া বিপথগামী হয়। বাল্যকাল হইতেই লাঠিবাজীতে তারাচাঁদ সিদ্ধহস্ত। যৌবনে তাহার সমকক্ষ লাঠিয়াল প্রায় মিলিত না। একবার ফৌজদারী সিপাহীদিগের সহিত হাঙ্গাম করিয়া, তাহাদের কয়েকজনকে যখম করিয়াছিল, সেই অপরাধে তাহার কারা-বাস হয় কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তারাচাঁদ কারাগারের গরাদে ভাঙ্গিয়া পলায়ন করে।

তারাচাঁদ মুক্তিলাভ করিয়া, আর বাড়ীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিল না। করিবার উপায়ও ছিল না। তারাচাঁদ একটা দস্যুদলে যাইয়া মিশিল। অল্পদিন পরেই দস্যুপতির মৃত্যু ঘটাতে, দলের অপরাপর লোক তারাচাঁদকে তাহাদের দলপতির স্থলাভিষিক্ত করিল। সেই দিন হইতে তারাচাঁদ মণ্ডলের নাম হইল—তারাসর্দ্দার।

শীঘ্রই তারাসর্দ্দারের দাপে দেশের লোক অস্থির হইয়া উঠিল। তাহার অত্যাচারে শৈলপুরের নিকটবর্ত্তী জনপদ সমূহ ব্যতিব্যস্ত হইল। ফৌজদার পর্য্যন্ত অস্থির হইলেন। তারাসর্দ্দার শিপাহীর রসদ লুণ্ঠিত, গ্রাম নগরে অগ্নি দিয়া গ্রামকে গ্রাম ভস্মসাৎ করিত। গ্রাম্য শান্তিরক্ষকের মাথা কাটিয়া বৃক্ষশিরে ঝুলাইয়া দিত। শেষে ফৌজদারের সেনা আসিলে তারাসর্দ্দার অপরাপর লোকজন সহ অদৃশ্য হইত; কিরূপ-ভাবে কোথায় থাকিত, কেহ তাহার সন্ধান জানিত না। ফৌজদার বহুচেষ্টা, বহু অর্থব্যয় করিয়াও, তাহার অনুসন্ধান পাইতেন না।

তারাসর্দ্দার বহুরূপী। নানাবেশে নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিত। নানা শ্রেণীর লোকের সহিত মিশিত। কিন্তু তাহার কয়েকটী গুণ ছিল, কেহ তাহার আশ্রিত হইলে প্রাণপাত করিয়া তাহার কার্য্যোদ্ধার করিত। অকারণে প্রায়ই জীব-হত্যা করিত না এবং স্ত্রীলোকের উপর কদাচিৎ অত্যাচার করিতে দেখা যাইত।

যে দিবস প্রাতঃকালে ব্রজেন্দ্রের উদ্যানমধ্যে অলকা জীবন হারাইয়াছে, সেই দিবস সন্ধ্যার প্রাক্কালে পক্ককেশ দুইজন সন্ন্যাসী শৈলপুরের পার্শ্ববাহিনী ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনীর তটে বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছে। সন্ন্যাসীদ্বয়ের মধ্যে একজন ছদ্মবেশী তারাসর্দ্দার, অপর তাহার অনুচর গোরাচাঁদ।

তারাসর্দ্দার কহিল, “আজ সকলে বড় বাঁচিয়া গিয়াছি। একটা বাগানের মধ্যে না লুকাইলে আজি একটা মহানিষ্ট ঘটিত। আমি তাড়াতাড়ি একটা গাছের উপর উঠিয়া বসি-

লাম, গাছের পাতাগুল খুব ঘন। তাহারা আমায় দেখিতে পায় নাই।"

গোরা। সর্দ্দার! তুমি অমন করিয়া একা কোথাও বাহির হইও না। হাতিয়ার সঙ্গে না লইয়া রাস্তা ঘাটে বাহির হওয়া বড় অন্যায়।

তারা। আমার নিকট অস্ত্র থাকিলে আজ চার বেটা চৌকিদারের মাথা উড়াইয়া দিতাম। গোরা! আজ এক আশ্চর্য্য রমণী দেখিয়াছি।

গোরা। আশ্চর্য্য কি রকম?

তারা। আমরা দস্যু—আমরাই শুধু নরহত্যা করি না, আবশ্যক হইলে অনেকেই করিয়া থাকে। স্ত্রীলোক এরূপ ভীষণ কাজে হস্তক্ষেপ করিতে পারে, পূর্ব্বে জানিতাম না।

গোরা। ডাক্তার বাবুর বাড়ীর পাশের বাগানে একটী স্ত্রীলোক হত্যা হইয়াছে শুনিয়াছি। যাহার বাগান, তাহাকে হত্যাকারী বলিয়া পাইকেরা চালান দিয়াছে।

তারা। সে নির্দ্দোষী।

গোরা। নির্দ্দোষী! বল কি? কে তবে হত্যা করিল?

তারা। একটী রমণী। তাহার সাহসের বাহাদুরী আছে। তাহার কার্য্য দেখিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়াছি।

গোরা। সে রমণী! কোথায় থাকে?

তারা। জানি না; তাহাকে পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই। ছুরি ধরিয়া গর্ব্বভরে যখন ঘাড় বাঁকাইয়া দাঁড়াইল, তখন ভাবিলাম, এ কামিনী আমারই উপযুক্ত। সত্য বলিতে কি গোরা! স্ত্রীলোক দেখিয়া কখন আমার মনে অন্যভাবের সঞ্চার

হয় নাই কিন্তু আজি প্রাতঃকালে সেই বীর্য্যবতী বামাকে দেখিয়া, আমার হৃদয় অস্থির হইয়াছে। যুবতী যেমন সুন্দরী, তেমনি বীর্য্যবতী ভয়ঙ্করী।

গোরা। সর্দ্দার! এইবার তুমি তাহাকে বিবাহ করিয়া সংসারী হইবে।

তারা। গোরা! সকলের অপেক্ষা তুই আমার অনুগত তোর কাছে কিছু গোপন করিব না। সংসারী হইবার সাধ আমার নাই। তবে তাহাকে পাইলে, এ রাজ্য ছাড়িয়া কোন নিরাপদ স্থানে গিয়া বাস করি। তোর উপরে দলের ভার দিয়া, তোকে সর্দ্দার করিয়া যাইব।

গোরা। বল কি সর্দ্দার!

তারা। প্রাণের কথা বা, তোকে প্রকাশ করিয়া বলিলাম। এ কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিস না। এখন একবার আমাকে চৌধুরী বাড়ীতে যাইতে হইবে। নিমের সহিত সাক্ষাতের প্রয়োজন আছে।

এই কথা বলিয়া, তারাসর্দ্দার গাত্রোত্থান করিল। গোরাও সঙ্গে সঙ্গে উঠিল। তারাচাঁদ সামান্য গ্রাম্যলোকের বেশ ধরিয়া, অক্ষয়কুমার চৌধুরীর বাড়ীতে তাঁহার ভৃত্য নিমচাঁদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিল। গোরাচাঁদ আড্ডাভিমুখে প্রস্থান করিল।

নিমচাঁদ মালতীর পুত্র। মালতীর বাড়ীতেই হরগোবিন্দ চৌধুরী অলকাকে আনিয়া রাখিয়াছিলেন। নিমচাঁদ হরগোবিন্দ চৌধুরীর পেয়ারের চাকর। সে বালককাল হইতে চৌধুরী-সংসারে কাজ করিতেছে।

জমিদার-বাটীর অন্তঃপুর-সংলগ্ন পুষ্পবাটিকা মধ্যে একটী বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া দুইজন পরস্পর কথাবার্ত্তা কহিতেছে। যমুনা এই সময়ে ব্রজেন্দ্রের সহিত কারাগারে সাক্ষাৎ করিয়া ফিরিয়া আসিল। ডাক্তার নিরঞ্জন বাবুর সহিত কারাধ্যক্ষের খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল, তাঁহারই কৌশলে যমুনা যুবকবেশে কারাগারে প্রবেশ লাভ করে। নিরঞ্জন বাবু কারাধ্যক্ষকে বলিয়াছিলেন, "আসামীর এক সহোদর আছে, সে হতভাগ্য বাক্‌শক্তিরহিত। বিদেশে থাকিত, অদ্য এখানে আসিয়া জ্যেষ্ঠের এই বিপদ শুনিয়া, তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ব্যাকুল হইয়াছে। আসামীর সহিত তাহার একবার সাক্ষাৎ করাইয়া দিন।" সেই অনুরোধের ফলেই যমুনা মূকবধির হইয়াও, কারাগারে প্রবেশলাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। যমুনা সন্ধ্যাকালে ছদ্মবেশে অন্দরের গুপ্ত দ্বার দিয়া, অপরের অলক্ষ্যে বহির্গত হইয়া যায়। এক্ষণেও বাগানের মধ্য দিয়া গুপ্তপথ অন্দরে প্রবেশ করিতে যাইতেছিল, কিন্তু সম্মুখে বৃক্ষতলে দুইজনকে দণ্ডায়মান দেখিয়া, সেও সাবধানে পার্শ্বে একটী লতাকুঞ্জের মধ্যে আত্মগোপন করিল। চন্দ্রালোকে যমুনা দেখিল, একজন তাহাদের বাটীর ভৃত্য নিমচাঁদ বা নিমে, অপর তাহার অপরিচিত। যমুনা তাহাদের প্রস্থান পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিল।

নিমচাঁদের সহচর অপর কেহ নহে—সন্ধ্যাকলের নদীতটের দুর্দ্দান্ত দস্যু তারাসর্দ্দার। তারাসর্দ্দার নিমচাঁদের কথার প্রত্যুত্তরে কহিল, "তুমি কিরূপে জানিলে সে ঘরে ধনরত্ন লুকাইত আছে?"

নিম। আমি গুজব কথার উপর নির্ভর করিয়া, তোমায় এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে বলি নাই, আমি এ বাটীতে অনেক দিন আছি। বাটীর সকল তত্ত্বই জানি। সে ঘরে যদি ধন রত্ন না থাকিবে, তবে এত সতর্কতার সহিত তালাবদ্ধ করিয়া রাখিবার প্রয়োজন কি? সে কক্ষে কেহ প্রবেশ করিতে পায় না। কর্ত্তার আমল হইতে এইরূপ দেখিতেছি।

তারা। এ তোমার অনুমান মাত্র। একটা অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া, এরূপ দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া ভাল নয়।

নিম। অনুমান নয়, প্রকৃত কথা। তবে যদি তোমার সাহসে না কুলায়, সে অন্য কথা।

তারাসর্দ্দার কোপাবিষ্ট হইয়া কহিল, "কি, আমায় তুই কাপুরুষ বলিস! কি বলিব নিমে, তুই আমার—মাসতুতো ভাই, নহিলে এইখানে আমি তোকে একবার সাহসের পরিচয়টা দেখাইয়া দিতাম।"

নিমচাঁদ দস্যু সর্দ্দারকে শান্ত করিয়া কহিল, "রাগ কর কেন দাদা। তোমাকে রাগাইবার জন্যই ওকথা বলিলাম।"

তারা। আচ্ছা আমি সম্মত হইলাম। কবে বল্?

নিম। কাল।

তারা। কাল হইবে না। আমার অপর কাজ আছে, কোন স্ত্রীলোকের নিকট বাকদত্ত আছি।

পাঠক হয়ত দস্যুর আবার প্রতিশ্রুতি শুনিয়া হাসিবেন। কিন্তু তারাসর্দ্দার যাহার নিকট যাহা স্বীকার করিত, প্রায়ই তাহার নড়চড় হইত না।

নিম। পরশ্ব।

তারা। আচ্ছা রাজী। রাত্রি ঠিক দ্বিপ্রহরের সময়ে আসিব। কোথায় তোমার সাক্ষাৎ পাইব?

নিম। এই খিড়কির দরজা খোলা থাকিবে। তুমি অবাধে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে। আমি দালানের পার্শ্বের ঘরে থাকিব, নির্দ্ধারিত সময় বাহির হইয়া আসিব। দ্বিতলের যে মহলে সেই ঘর অবস্থিত, তাহার নিকটবর্ত্তী কোন ঘরে কেহ শয়ন করে না। বাবু (অজয়কুমার) সকলের শেষের কক্ষে শয়ন করেন। তাঁহার ভগ্নী সেই মহলে একটী কক্ষে থাকে সত্য, কিন্তু কালা এবং বোবা। তাহার দ্বারা কোন বিপদের আশঙ্কা নাই।

তারা। বেশ, সকলই বুঝিলাম। পরশ্ব রাত্রি ঠিক দ্বিপ্রহরের সময় আসিব; তুমি খিড়কির দরজার নিকট আমার জন্য অপেক্ষা করিবে।

নিমচাঁদ স্বীকার হইয়া. খিড়কি দিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল, এদিকে তারা সর্দ্দার বাগানের দ্বার দিয়া প্রস্থান করিল।

পরামর্শকারীদ্বয় প্রস্থান করিলে, যমুনা লতাকুঞ্জ হইতে সাবধানে বাহির হইয়া গুপ্তপথে আপন কক্ষে প্রস্থান করিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

বৃদ্ধ শেঠজী।

কল্লোলিনী কালিন্দীর কূলে মামুদপুর নগর। শৈলপুর হইতে উহার দূরত্ব প্রায় দুই ক্রোশ। এখানে অধিকাংশই মুসলমানের বাস। মাঝে মাঝে হিন্দুরও বসতি আছে। রামগোবিন্দ শেঠ এ অঞ্চলের মধ্যে বিখ্যাত ধনী। তাঁহার বয়ঃক্রম প্রায় অশীতি বৎসর। তাঁহাকে সকলে শেঠজী বলিয়া ডাকিত; সুতরাং আমরা আমাদের আখ্যায়িকার মধ্যে তাঁহার নামে উল্লেখ না করিয়া উক্ত শেঠজী শব্দেই অভিহিত করিব।

শেঠজী কুসীদজীবী। টাকা ধার দেওয়া তাঁহার ব্যবসা। চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী স্থানের এবং দূর দূরান্তর হইতে লোক আসিয়া তাঁহার নিকট ঋণ গ্রহণ করিত। তাঁহার সুদের হার সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ কিন্তু অতিশয় বিশ্বাসী বলিয়া সকলেই তাঁহার নিকট গমন করিত। উত্তমর্ণ এবং অধোমর্ণ ব্যতীত ঋণের কথা অপরের কর্ণগোচর হইত না।

শেঠজীর দ্বিতল বাটী। কুসীদজীবী মাত্রেই কিছু কৃপণ-স্বভাব। আমাদের বৃদ্ধ শেঠজীও সে সাধারণ নিয়মের গণ্ডির বাহিরে যান নাই। তাঁহার সংসারে দ্বিতীয় পক্ষের যুবতী

স্ত্রী এবং প্রথম পক্ষের স্ত্রীর গর্ভজাত একটী পুত্র, পুত্রটী বয়ো-প্রাপ্ত। সে রাজমহলে ব্যবসা বাণিজ্য করিত। সুতরাং তাঁহার বাড়ীতে তিনি, তাঁহার স্ত্রী এবং একটী পরিচারিকা ব্যতীত আর কেহ ছিল না।

রাত্রি প্রহরাতীত, শেঠজী আহারাদি করিয়া বিশ্রাম লাভার্থ শয়নকক্ষে প্রবেশ করিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে বহির্দ্বারে ঘন ঘন বলদপিত করাঘাতের শব্দ শুনিয়া, তাঁহার স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "সর্ব্বনাশ। আজ আবার কেন?"

স্ত্রী জিজ্ঞাসিল, "ও কে?"

শেঠজী। এ নিশ্চয়ই তারাসর্দ্দার। দ্বারে করাঘাতের শব্দ শুনিয়াই আমি বুঝিতে পারিয়াছি। যাই, দরজা খুলিয়া দেখি।

বৃদ্ধ আলোক হস্তে কম্পিতহৃদয়ে আসিয়া দরজা খুলিয়া দিলেন। তারাসর্দ্দার বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। [illegible] কাষ্ঠহাসি হাসিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "সর্দ্দার, আজ [illegible] মনে করিয়া?"

তারা। চল, উপরে চল, বলিতেছি। [illegible]

উভয়ে দ্বিতলে বৈঠকখানায় আসিলেন। [illegible] কহিল, "তোমার নিকট কিছু আবশ্যক [illegible]!"

কম্পিতকণ্ঠে বৃদ্ধ কহিলেন, "[illegible] আবশ্যক? কেন, তোমায় প্রতিমাসে যাহা দিবার কথা [illegible] দিয়াছি।"

তারা। অন্য [illegible] কি [illegible] নাই?

শেঠজী। তা পারে [illegible] এমন দরকারটা কি?

তারা। বিবি রৌশিনারা [illegible]?

বৃদ্ধের মুখ শুখাইল। ইতস্ততঃ করিয়া কম্পিতকণ্ঠে কহিলেন, "রৌশিনারা—রৌশিনারা——"

দস্যুপতি গৃহতলে সজোরে পদাঘাত করিয়া কহিল, "হাঁ হাঁ—রৌশিনারা। গোলাম মীর মহম্মদ খাঁর স্ত্রী।"

কম্পিতকণ্ঠে ভগ্নস্বরে শেঠজী কহিলেন, হাঁ, চিনি বৈ কি।

তারা। তোমার নিকট বিবি সাহেবের যে হীরকালঙ্কার আছে, আমায় দাও।

শেঠজী। তোমায়!

তারা। হাঁ আমায়।

শেঠজী। আমি যে পাঁচ হাজার টাকা দিয়াছি। আমার নিকট যে বন্ধক আছে।

তারা। বিবির বিশেষ দরকার পড়িয়াছে, কাল সে গহনা না হইলে, তিনি নিমন্ত্রণে যাইতে পারিবেন না।

শেঠজী। টাকাটা—কি হ—

তারা সর্দার চক্ষু আরক্ত করিয়া কহিল, "শেঠজী! আমার বেশীক্ষণ বিলম্ব করিবার সময় নাই। শীঘ্র লইয়া আইস।"

শেঠজী। আমি গরীব লোক দাদা—এতটা টাকা আমার লোকসান করো না। তোমাকে মাসে মাসে যা দিবার কথা তাহা ত দিতেছি, তবে কেন আমার সর্ব্বনাশ করিতেছ।

তারা। স্ত্রীলোকের অনুরোধ। সুন্দরীর নিকট আমি প্রতিশ্রুত আছি। যাও, শীঘ্র তাঁহার অলঙ্কারগুলি আনিয়া দাও। নচেৎ—

তারাসর্দার হঠাৎ থামিল, কিন্তু তাহার দক্ষিণ হস্ত কটিলগ্ন অসিকোষের উপর স্থাপিত হইল। বৃদ্ধের নজর

সে দিকে পড়িবামাত্র, তাহার হৃদয়শোণিত শুষ্ক হইয়া গেল। বৃদ্ধ গত্যন্তর নাই দেখিয়া সম্মত হইলেন। বিষণ্নমুখে গজদন্ত-নির্ম্মিত সুন্দর কৌটা সমেত সমস্ত হীরকালঙ্কারগুলি আনিয়া দিলেন। তারা সর্দ্দার কৌটা খুলিয়া রৌশিনারার বর্ণনামত সমস্ত মিলাইয়া লইল। তাহার পর শেঠজীকে অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিল।
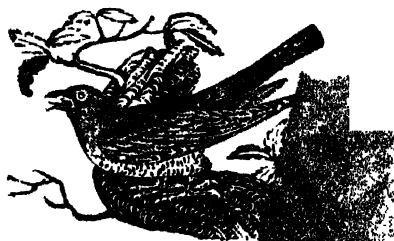
পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

রৌশিনারা।

নীল নীরদনিভ শ্যামকান্তি যমুনার কূলে গোলাম মীর মহম্মদ খাঁর বিস্তীর্ণ সৌধরাজী। খাঁসাহেব খনিয়াদি বড় লোক। তাঁহার পিতামহ জাহাঙ্গীরের পাঁচহাজারী অশ্বারোহীদলের অধিনায়ক ছিলেন। তাঁহার পিতা ব্যবসাবাণিজ্য করিয়া প্রচুর অর্থ রাখিয়া যান। মীর মহম্মদ বহুদিন নবাব-সরকারে কার্য্য করিয়াছেন, এক্ষণে পরিণতবয়সে কর্ম্ম হইতে অপসৃত হইয়া, নবপরিণীতা নবীনার প্রেমসাগরে আকণ্ঠ মজ্জিত হইয়া [illegible] আছেন।

রৌশিনারা খাঁ সাহেবের তৃতীয়পক্ষের স্ত্রী। প্রথম দুই স্ত্রী [illegible]। প্রথমা ও দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্রকন্যার অভাব না থাকিলেও, এবং খাঁ সাহেব স্বয়ং বার্দ্ধক্যের দ্বারদেশে উপনীত হইলেও, তাঁহার যৌবনসুলভ উদ্দাম লালসা এবং ভোগবিলাসের প্রবৃত্তি নিবৃত্তি পায় নাই। খাঁ সাহেব প্রৌঢ়বয়সে সুন্দরী রৌশিনারার পাণিগ্রহণ করিলেন। রৌশিনারার কমনীয় দেহে যৌবনের সুকুমার কান্তি যতই প্রকটিত হইতে লাগিল, খাঁ সাহেব [illegible] জরামন্দিরের দিকে দুই

এক পদ করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। বৃদ্ধপতির আদরযত্নের বা ভালবাসার ত্রুটী ছিল না, কিন্তু তাহাতে যুবতী রৌশিনারার বাসনা-ব্যাকুল উদ্দামহৃদয়ের অতৃপ্ত লালসার শান্তি হইত না। খাঁ সাহেবের বিষয়-বিভবের অভাব ছিল না, কিন্তু রৌশিনারা পতির বিপুল বিভব দেখিয়া, কিংবা তাঁহার অন্তরের ভালবাসা পাইয়াও, আপনার হৃদয়ের লক্ষ্য স্থির রাখিতে পারিল না। রৌশিনারা অল্পদিনের মধ্যেই গিয়াস উদ্দিন খাঁ নামক একজন বাল্যসহচরের করে আত্মসর্পণ করিয়া বসিল। এই গিয়াস উদ্দিন এখন তাহার যৌবনতরির কর্ণধার—হৃদয়রাজ্যের অধীশ্বর।

গিয়াস উদ্দিন সৈনিক বিভাগে কর্ম্ম করেন। তাঁহার অধীনে পাঁচশত অশ্বারোহী। তাঁহার পিতার অতুল ঐশ্বর্য্য ছিল, কিন্তু দ্যূতক্রীড়ায় আসক্ত হইয়া, অল্পদিনের মধ্যে [illegible] তাহার অধিকাংশ নষ্ট করিয়াছেন। এখন স্বোপার্জ্জি[illegible] উপরই তাঁহার নির্ভর। এই তরলমতি উত্তপ্ত[illegible] যুবকই রৌশিনারার প্রেমকুঞ্জের মধুপ। খাঁ [illegible] তাঁহার অব্যাহত গতিবিধি ছিল, সুতরাং [illegible] মিলনে বড় একটা ব্যাঘাত ঘটিত না।

খাঁ সাহেব কার্য্যান্তরে নান্দীগ্রা[illegible] গমন করিয়াছেন। রাত্রিতে তাঁহার প্রত্যাগমনের সম্ভা[illegible] ছিল না। [illegible]নারা উজ্জ্বলালোকিত আপন সুসজ্জিত কক্ষমধ্যে [illegible] বাতায়নপার্শ্বে উপবেশন করিয়া, মুক্তপ্রকৃতি[illegible] [illegible]করিতেছে। রাত্রি প্রায় প্রহরাতীত। যমুনার [illegible] সলিলরাশি প্রশান্ত, কচিৎ মন্দপবনান্দোলিত [illegible] অনুচ্চ বিচিমালা

তুলিয়া কলস্বরে বহিয়া যাইতেছে। নীলাম্বুদখণ্ডকোলে গগনতলে শশধর অনন্ত নক্ষত্ররাজি জ্বলিতেছে, তাহাদের শান্ত প্রতিবিম্ব প্রশান্তহৃদয়া যমুনার মুক্তহৃদয়ে প্রতিফলিত হইয়া অল্প অল্প কাঁপিতেছে—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গের সহিত রঙ্গপরবশ হইয়া নাচিতেছে। রৌশিনারা বারেক নক্ষত্র চন্দ্রমাখচিত নীলনভোতলের দিকে চাহিতেছে, বারেক চন্দ্রকরোজ্জ্বল নক্ষত্রালোকিত যমুনাবক্ষের দিকে উদাসদৃষ্টি বিক্ষেপ করিতেছে। প্রকৃতির এ নগ্নসৌন্দর্য্যে তাহার হৃদয় আসক্ত হইতেছে না। তাহার হৃদয়ে এখন গুরু ভাবনা, সে ভাবনাপ্লাবন ঠেলিয়া নিসর্গশোভা হৃদয়-মন্দিরে প্রবেশলাভ করিতে পারিতেছে না। রৌশিনারার এত ভাবনা কিসের ?

রৌশিনারার অনেক ভাবনা। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গিয়াস উদ্দিন দ্যূতাসক্ত। দ্যূতক্রীড়ায় প্রায়ই তাঁহার পরাভব হয়। [illegible] অর্থের অভাব হইলে প্রায়ই তাঁহাকে রৌশিনারার [illegible] হইতে হয়। প্রেমবিমূঢ়া রৌশিনারা প্রেমপাত্রের মন[illegible] পতির সর্ব্বনাশ করিয়া, উপপতির অক্ষক্রীড়ার দেনা [illegible] করেন। এ রকম মাসের মধ্যে অন্ততঃ দুই তিনবার [illegible] করিতে হয়। এক মাস পূর্ব্বে গিয়াস উদ্দিন একর[illegible] হাজার টাকা বাজী হারেন। তিন দিনের মধ্যে টা[illegible] শোধ করিবার কথা। রৌশিনারার নিকট আসিয়া কাঁ[illegible] পড়িলেন, বলিলেন, “আমায় বাঁচাও, নহিলে আমার মান [illegible] যায়। লোকের নিকট অপদস্থ হইতে হইলে আমি আত্মহত্যা করিব।”

গিয়াসউদ্দিন আত্মহত্যা করিবে। রৌশিনারা আর কি

স্থির থাকিতে পারে! হাতে টাকা ছিল না, আপনার বহুমূল্য হীরকালঙ্কার বৃদ্ধ শেঠজীর নিকট বন্ধক রাখিয়া পাঁচ হাজার টাকা গিয়াস উদ্দিনকে দিল। গিয়াস উদ্দিন প্রতিজ্ঞা করিল, জীবনে আর অক্ষক্রীড়া করিবে না।

রৌশিনারা মনে করিয়াছিল, কোনরূপে টাকাটা সংগ্রহ করিয়া, অলঙ্কারগুলির উদ্ধার করিয়া আনিবে। সেগুলি সচরাচর ব্যবহার করে না, সুতরাং স্বামী কিছুই জানিতে পারিবে না। কিন্তু বিধাতা বৈরী হইল। রৌশিনারা কোন-রূপে টাকার সংগ্রহ করিতে পারিল না। এদিকে এক বিভ্রাট উপস্থিত। নান্দীগ্রামে ফৌজদারের বাটীতে কোন কর্ম্মোপ-লক্ষে খাঁ সাহেবের সপরিবারে নিমন্ত্রণ হইল। রৌশিনারার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। অলঙ্কার উদ্ধারের অন্য উপায় না দেখিয়া, তাহার এই পাপকর্ম্মে সহায়তাকারিণী পরিচারিকার দ্বারা দস্যুপতি তারা সর্দ্দারকে সংবাদ দিল। ঐ পরিচারিকার সহিত তারাসর্দ্দারের দলের কোন কে[illegible] বিশেষ আলাপ ছিল। তাহার সাহায্যে তারাসর্দ্দারে[illegible] সংবাদ পৌঁছিল। তারাসর্দ্দার রৌশিনারার [illegible] উদ্ধার করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইল।

অদ্য রাত্রি এক প্রহরের মধ্যে তা[illegible] আসিবার কথা। কিন্তু এখনও তাহার দেখা [illegible] রৌশিনারা ক্রমশঃ চঞ্চল হইয়া উঠিতে লাগিল। [illegible] মধ্যে অলঙ্কার না পাইলে, রাত্রি প্রভাতে স[illegible] প্র[illegible]শ হইয়া পড়িবে। ফৌজদারের বাড়ী কাল [illegible]ণ—খাঁ সাহেব কাল যখন জিজ্ঞাসা করিবেন, "হীর[illegible], পরিলে না?" তখন

রৌশিনারা কি উত্তর করিবে? রৌশিনারা আকুল হইয়া উঠিল। প্রণয়-পাত্রের মানরক্ষার্থ স্বামীপ্রদত্ত বহুমূল্য অলঙ্কার বন্ধক দিয়া তাহাকে টাকা দিয়াছিল, এখন যে, তাহার প্রাণ যায়। কি উপায় অবলম্বন করিলে সকল বিষয় গোপন থাকে—খাঁ সাহেব তাহার গুপ্তপ্রেমের বিন্দুবিসর্গ অবগত হইতে না পারে—তাহাই এখন রৌশিনারা বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। কত কি ভাবিল—মনে মনে কত কি গড়া-পেটা করিল, কিন্তু কিছুই মনোমত হইল না—কোন কল্পনাই যুক্তিসঙ্গত বোধ হইল না। রৌশনারা আকুল হইয়া, উদাস-নয়নে কখন জ্যোৎস্নাপ্লাবিত আকাশের দিকে চাহিতে লাগিল, কখন কৌমুদী-বিধৌত যমুনাবক্ষের দিকে স্থিরদৃষ্টি সঞ্চালন করিতে লাগিল। যতদূর দৃষ্টি চলে, রৌশি-নারা চাহিয়া দেখিল, কিন্তু কোন পদার্থ দৃষ্টিগোচর হইল না। সুন্দরী অস্থির হইয়া, বাতায়নসন্নিধান হইতে গাত্রো-[illegible]ান করিয়া, কক্ষমধ্যে পদচারণা করিতে লাগিল। যুবতী [illegible] গবাক্ষের নিকট আসিল। দূরে যমুনার নীলসলিল-[illegible] একখানি ক্ষুদ্র তরণী অস্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হইল। রৌশি[illegible]ক্ষ্য সেই দিকে চাহিয়া রহিল। নৌকার উপরে [illegible]রোহী। আনন্দে যুবতীর হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিল।

নৌকারোহী [illegible]টার নিকটবর্ত্তী ঘাটে একটা খোঁটায় নৌকা বাঁ[illegible]র অবতীর্ণ হইল। রৌশিনারা যানারোহীকে চিনিতে [illegible]য়া স্বয়ং নীচে নামিয়া আসিল এবং খিড়কির দ্বার [illegible] দিল। আগন্তুক সুন্দরীকে

সেলাম করিয়া, বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। সুন্দরী দ্বার রুদ্ধ করিয়া, নবাগতকে তাহার পশ্চাদনুসরণ করিতে ইঙ্গিত পূর্ব্বক নীরবে আপন কক্ষে আসিল।

নবাগত তারাসর্দ্দার। তারাসর্দ্দার গৃহপ্রবেশ করিলে, রৌশিনারা কম্পিতহৃদয়ে জিজ্ঞাসা করিল, "সর্দ্দার, সংবাদ কি?"

দস্যুপতি হাসিয়া কহিল, "তারাসর্দ্দারের কথা কবে লজ্বিত হইয়াছে সুন্দরি।" এই বলিয়া বস্ত্রের মধ্য হইতে কৌটাটী বাহির করিয়া রূপসীর হস্তে দিল। সুন্দরী কৌটা খুলিয়া আপনার অলঙ্কারগুলি মিলাইয়া লইল। হৃদয় হইতে দুর্ভাবনা এবং উদ্বেগের গুরুভার অপনীত হওয়াতে রৌশিনারার সুন্দর মুখকমল আরও হর্ষবিকসিত হইয়া উঠিল। সুন্দরী সস্মিত-বদনে কহিল, সর্দ্দার! তুমি আজ আমার যে উপকার করিলে, তাহার প্রতিদান করা আমার সাধ্যাতীত। আমি তোমাকে এই দুই শত টাকা পুরস্কার স্বরূপ দিতেছি।"

এই বলিয়া রৌশিনারা একটা মুদ্রাপূর্ণ তোড়া বাহির করিয়া, দস্যুপতির সম্মুখে ধরিল। দস্যুপতি বামহস্তে রৌশনারার মুদ্রাসমেত হস্ত এবং দক্ষিণকরে তাহার আনন্দ-রাগানুরঞ্জিত গোলাপী গণ্ড দুইটী ধরিয়া, হাসিয়া কহিল, "সুন্দরি! তোমার টাকায় আমার আবশ্যক নাই। তোমার নিকট আমি অন্যপ্রকার উপকারের প্রত্যাশী।"

অপমানে মুহূর্ত্তের জন্য পাঠানকুমারীর হৃদয়-শোণিত উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই আপনার অবস্থা স্মরণ করিয়া সাহস সহকারে কৃত্রিমহাস্যে অধর রঞ্জিত করিয়া কহিল, "কি উপকার সর্দ্দার?"

সর্দ্দার। তুমি লিখিতে জান ?

রৌশি। জানি।

একখানি খাতা বাহির করিয়া সর্দ্দার কহিল, "আমি যাহা বলি, তাহা লিখিয়া দাও। ভয় নাই, আমি তোমার কোন অনিষ্ট করিব না।"

রৌশিনারা সম্মত হইল, সর্দ্দার বলিতে লাগিল ;—"আমি আমার উপপতি গিয়াস উদ্দিন খাঁর দ্যূতক্রীড়ার ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য আমার অলঙ্কারগুলি বৃদ্ধ শেঠজীর নিকট বন্ধক দিয়াছিলাম, কিন্তু দস্যু সর্দ্দার তারাচাঁদের সাহায্যে উদ্ধার করিয়া লই।"

কম্পিত হৃদয়ে কম্পিতহস্তে রৌশিনারা এই কয়েক ছত্র লিপিবদ্ধ করিয়া, আপনার নাম স্বাক্ষর করিল। তারাসর্দ্দার গাত্রোত্থান করিয়া কহিল, "যদি কখন সে দিন আসে, ইহার সাহায্যে আমি আমার মাথা বাঁচাইতে পারিব।"

রৌশিনারার কর্ণে সে কথা প্রবেশ করিল না, সে আপন চিন্তাতেই মগ্ন। এখন কোনরূপে তারাসর্দ্দারকে বিদায় করিতে পারিলে তাহার ভয় দূর হয়। ভবিষ্যৎ ভাবিবার তাহার এখন অবকাশ নাই।

তারাসর্দ্দার অর্গলে হস্তার্পণ করিয়াছে মাত্র, এমন সময়ে বাহিরে মৃদু করাঘাতের শব্দ হইল। সে সাঙ্কেতিক শব্দের মর্ম্ম বুঝিয়া, রৌশিনারার মুখ শুকাইয়া গেল। বিদ্যুৎবেগে তারাচাঁদের হস্ত ধরিয়া ইঙ্গিতে নিবারণ করিল এবং তাহাকে দ্বারের নিকট হইতে সরাইয়া লইয়া গেল। রুদ্ধকণ্ঠে ভয়-বিহ্বলা সুন্দরী দস্যুপতির করে ধরিয়া বিনীতস্বরে কহিল,

"সর্দ্দার! আমায় রক্ষা কর। তুমি কিছু সময় এই পালঙ্কের পাশে—এই দেখ, কয়েকটা বড় বড় বালিশ জড় করা রহিয়াছে, ইহার মধ্যে লুকাইয়া থাক। তোমার কোন ভয় নাই, ও এখনি চলিয়া যাইবে।"

সর্দ্দার ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। পুনরায় দ্বারে মৃদু করাঘাতের শব্দ হইল। রৌশিনারার পুনঃ পুনঃ কাতর প্রার্থনায় সর্দ্দার সম্মত হইয়া কহিল, "কিন্তু সাবধান রৌশিনারা, ইহার মধ্যে যদি কোন কু-অভিসন্ধি থাকে, যদি ঘুণাক্ষরেও বিশ্বাসঘাতকতার কোন লক্ষণ জানিতে পারি, আমার তীক্ষ্ণধার তরবারি—তোমার সুকুমার মুখ দেখিয়া মুগ্ধ হইবে না।

দস্যুপতি প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই,পর্য্যঙ্কের পার্শ্বস্থিত সজ্জীভূত উপাধান কয়েকটীর মধ্যে আত্মগোপন করিয়া শয়ন করিল। রৌশিনারা তাহার উপরে একখানি শয্যাস্তরণ আচ্ছাদনস্বরূপ চাপা দিল। তারাসর্দ্দার নিস্পন্দ নিঃসংজ্ঞবৎ পড়িয়া রহিল। রৌশিনারা ধীরে ধীরে দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া দিল, সেনাপতি গিয়াস উদ্দিন খাঁ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

গুপ্ত-প্রেম।

নীরব নিশীথ। কোথাও কাহার সাড়াশব্দ নাই। স্ফুট চন্দ্রালোকে জগৎ হাসিতেছে। রাত্রির শান্ত সুশীতল সমীরণ ধীরে ধীরে বৃক্ষপত্র কাঁপাইয়া—লতাশিরে হাস্যাননা কুসুম-বালার মাথাটী হেলাইয়া বহিতেছে। দিবসের কর্ম্মব্যস্ত শ্রান্ত জীব এখন সুখে শান্তিময়ী সুষুপ্তির সুকোমল কোলে শুইয়া বিরামলাভ করিতেছে। মামুদপুরের সকলেই ঘরে ঘরে নিদ্রিত। কেবল একস্থানে একখণ্ড প্রলয়ের সূত্রপাত হই-তেছে—একস্থানে একটী সংসারের সুখশান্তির অশান্তির হলা-হলে জর্জ্জরিত হইবার উপক্রম হইতেছে।

গোলাম মীর মহম্মদ খাঁর সুধাধবলিত সৌধরাজী সুধাকরের করপ্লাবনে হাসিতেছে। ইহার চারিদিকে শান্তির সুধাধারা ছড়াইয়া পড়িতেছে। কিন্তু ইহার অভ্যন্তরে এই নীরব নিশীথে যে অশান্তির অনল নীরবে ধূমায়িত হইতেছে, সে দিকে কাহারও লক্ষ্য নাই। পর্য্যঙ্কের উপর উপাধানপার্শ্বে শয্যাস্তরণে অঙ্গ ঢাকিয়া, দুর্দ্দান্ত দস্যু তারাসর্দ্দার শায়িত—কক্ষমধ্যস্থলে সুকোমল জাজিমের উপর পরস্পরের প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ

রৌশনারা এবং গিয়াস উদ্দিন। কক্ষবাহিরে দ্বারসমীপে উৎকর্ণ হইয়া দণ্ডায়মান স্বয়ং গৃহস্বামী, পতিতা রৌশিনারার পতি বৃদ্ধ গোলাম মীর মহম্মদ খাঁ। রোষে বৃদ্ধের আপাদ-মস্তক কাঁপিতেছে।

খাঁ সাহেবের অদ্য রাত্রিতে নান্দীগ্রাম হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার কথা ছিল না। যে কার্য্যের জন্য তাঁহার নান্দীগ্রামে যাওয়া, তাহা সন্ধ্যার মধ্যেই সুসম্পন্ন হয়, সুতরাং রাত্রিবাস করিবার আর আবশ্যক হয় না। গৃহস্বামীর একান্ত অনুরোধে পড়িয়া, তাঁহার বাটীতে আহারাদি করিয়া একমাত্র পরিচারক সমভিব্যাহারে বাটী প্রত্যাগত হন। যখন বাটীর নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন, তখন দেখিতে পাইলেন, একব্যক্তি চাবির সাহায্যে তাঁহার বাটীর গুপ্তদ্বার উন্মোচন পূর্ব্বক বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। তাঁহার মনে ঘোর সন্দেহ উপস্থিত হইল। কাহাকে কিছু না বলিয়া, ধীরে ধীরে নিঃশব্দে অন্তঃপুর মধ্যে উপস্থিত হইলেন। অন্তঃপুরে তাঁহার শয়ন-কক্ষদ্বারে রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময়ে এক যুবক দণ্ডায়মান। তিনি তখনও গিয়াস উদ্দিনকে চিনিতে পারেন নাই। রৌশিনারা দ্বার মুক্ত করিল, গৃহমধ্যস্থ আলোকের ছটা যুবকের মুখের উপর পড়িবামাত্র তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন। রৌশিনারার চরিত্রের উপর তাঁহার ঘোর সন্দেহ জন্মিল। যে রৌশিনারাকে তিনি প্রাণাপেক্ষা ভালবাসেন—যাহার সুখসন্তোষ বিধানের জন্য তিনি প্রাণপাত করিতেও কুণ্ঠিত নন, সেই রৌশিনারা—সেই অকলঙ্ক সৌন্দর্য্যময়ী তাঁহার বৃদ্ধবয়সের জীবনাবলম্বন পত্নী কলঙ্কিনী, অপরের প্রেমাভিলাষিণী,

এ কথায় সহসা আস্থা স্থাপন করিতেও তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। সহসা কোন কথা না বলিয়া, দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া উভয়ের মধ্যে কি কথাবার্ত্তা হয় শুনিতে লাগিল।

গিয়াস উদ্দিন গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াই, রৌশিনারাকে বাহুপাশে বেষ্টন করিয়া ধরিলেন। রৌশিনারা কিয়ৎক্ষণ রসাবেশে অভিভূত হইয়া তাঁহার আলিঙ্গনমধ্যে স্থিরভাবে রহিল, তারপর ধীরে ধীরে ভুজপাশ অপসারিত করিয়া দণ্ডায়মান হইল। গিয়াস উদ্দিন সুন্দরীর চিবুক ধরিয়া কহিলেন, "রৌশিনারা! আমি বড়ই হতভাগ্য! তোমার মত সুন্দরীর ভালবাসা পাইয়াও, আপনাকে সুখী করিতে পারিলাম না। আমি কিছুতেই পূর্ব্বাভ্যাস ত্যাগ করিতে পারিতেছি না। আমি আবার জুয়া খেলিতে গিয়া হারিয়াছি।"

কাতরকণ্ঠে মৃদুস্বরে রৌশিনারা কহিল, "আবার জুয়ার আড্ডায় ঢুকিয়াছিলে? আবার হারিয়াছ? জুয়া খেলাই তোমার সর্ব্বস্ব হইল—আমি তোমার কেহ নই—"

বাধা দিয়া গিয়াস উদ্দিন কহিলেন, "মাপ কর রৌশিনারা, আমি তোমার নিকট শপথ করিলেও—সত্য ভঙ্গ করিয়াছি। আমি তোমায় প্রাণাপেক্ষা ভালবাসি। কিন্তু তোমার ভালবাসা ভোগ করা আমার অদৃষ্টে নাই।"

ব্যথিত হইয়া, বিহ্বলা রৌশিনারা কহিল, "সে কি গিয়াস! এ কি কথা? আমি কি তোমায় ভালবাসি না? তোমার জন্য যে আমি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে প্রস্তুত? তুমি যে আমার প্রাণাধিক।"

রৌশিনারা প্রথমতঃ ভয়ে ভয়ে, জড়িত অস্পষ্টস্বরে কথা

কহিতেছিল। তারাসর্দ্দার বালিশের পার্শ্বে লুকাইত, পাছে সে সকল কথা শুনিতে পায়, সেই আশঙ্কায় রৌশিনারা মৃদুকণ্ঠে, ইষারায় ইঙ্গিতে কথা কহিতেছিল, কিন্তু কথায় কথায় যখন প্রণয়পাত্রের প্রেমরা খেলার কথা উঠিল, যখন গিয়াস উদ্দিন হতাশহৃদয়ে বিষাদমাখাস্বরে আপনার জীবনের প্রতি ধিক্কার দিতে লাগিল, তখন রৌশিনারা আত্মবিস্মৃত হইল—গৃহমধ্যে তারাসর্দ্দারের কথা ভুলিয়া গেল। গিয়াসগত-প্রাণা বিমূঢ়া রৌশিনারা তাহার কণ্ঠলগ্ন হইয়া কাতরকণ্ঠে কহিল, "ভয় কি গিয়াস! আমি থাকিতে তোমার ভয় কি? যতদিন আমার হাতে কপর্দ্দকেরও সংস্থান থাকিবে, ততদিন তোমায় অর্থাভাবে কষ্ট পাইতে হইবে না। তোমার মুখ মলিন দেখিলে আমার হৃদয় ফাটিয়া যায়—তোমায় দেখিয়াই—"

রৌশিনারার বাক্য সমাপ্ত হইল না, মুখের কথা মুখেই রহিল। মহম্মদ খাঁ আর সহ্য করিতে পারিলেন না। যাহা দেখিয়াছেন, যাহা শুনিয়াছেন, তাহাই যথেষ্ট। অন্তঃপুর কক্ষমধ্যে রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় পরপুরুষের সহিত পত্নীর প্রেমালাপ! খাঁ সাহেবের হৃদয়-শোণিত উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। পদাঘাতে গৃহদ্বার মুক্ত করিয়া, ঘূর্ণিতনেত্রে কক্ষদ্বারে দণ্ডায়মান হইলেন। ক্রোধে সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। মুখ দিয়া সহসা কোন কথা বাহির হইল না। ভয়ে বিস্ময়ে রৌশিনারা বিহ্বলা! তখনও পরস্পর পরস্পরের আলিঙ্গন মধ্যে অবস্থিত, তখনও রৌশিনারা-স্বর্ণলতা গিয়াস-তমালে বিলম্বিতা। সহসা গিয়াসের চমক ভাঙ্গিল, রৌশিনারাকে বাহুপাশ হইতে মুক্ত করিয়া দূরে অধোবদনে সরিয়া দাঁড়াইল।

খাঁ সাহেব কম্পিতস্বরে কহিলেন, "রৌশিনারা!"

তাঁহার মুখ দিয়া আর বাক্য নির্গত হইল না। অঙ্গযষ্টি থর থর কাঁপিতে লাগিল। কম্পিতপদে তাহার নিকটবর্ত্তী হইয়া, তাহার হস্ত চাপিয়া ধরিলেন। গিয়াস উদ্দিন এই অবসরে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া যাইতেছিলেন, খাঁ সাহেব তাহাকে এক পদাঘাত করিয়া কহিলেন, "দূর হও বিশ্বাসঘাতক নরকের কীট! দূর হও আমার অন্তঃপুর হইতে!"

পদাহত গিয়াস সম্মুখ ফিরিয়া দাঁড়াইলেন কিন্তু কোন কথা না বলিয়া পরমুহূর্ত্তে খাঁ সাহেবের অন্তঃপুর ত্যাগ করিয়া অবনতবদনে প্রস্থান করিলেন।

মহম্মদ পত্নীকে কহিলেন, "রৌশিনারা! পাপিয়সি! এই তোর কর্ম্ম? এই তোর পতিব্রতাধর্ম্ম? আমার ভালবাসার এই প্রতিদান? আমি বৃদ্ধ সত্য কিন্তু তোকে সুখ-স্বচ্ছন্দে রাখিতে আমি কোন ত্রুটীই করি নাই। বৃদ্ধবয়সে আর নারীহত্যা করিব না। আমার এ অন্তঃপুরে তোর আর স্থান হইবে না। নন্দীগ্রামের রেশমীকুঠীর কয়েদখানায় তোকে আজীবন বন্দিনী করিয়া রাখিব।"

এই কথা বলিয়া, খাঁ সাহেব কক্ষ হইতে বহির্গত হইলেন। কক্ষের বাহিরে আসিয়া দ্বারে চাবি বন্ধ করিলেন। রৌশিনারা আপনার শয়নকক্ষ মধ্যে বন্দিনী হইয়া রহিল।

নন্দীগ্রাম মামুদপুরের নিকটবর্ত্তী একটী গণ্ডগ্রাম। সেখানে গোলাপ মীর মহম্মদ খাঁর একটী রেশমের কুঠী ছিল। সে কুঠী সম্বন্ধে নানারূপ জনশ্রুতি আছে। মীর মহম্মদের পিতা অবাধ্য প্রজা বা দরিদ্র ঋণগ্রস্ত কৃষককুলকে কুঠীর মধ্যস্থিত

কারাগারে বন্দী করিয়া রাখিতেন। কুঠীরের চারিদিকে বন জঙ্গল! উৎপীড়িত ব্যক্তির কাতর রোদন কাহারও কর্ণকুহরে প্রবেশ করিত না। নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে ঋণ বা দাদনের টাকা পরিশোধ করিতে না পারিলে, কোন হতভাগ্যকে জীবদ্দশায় কেহ বাহির হইতে দেখে নাই। রৌশিনারা এ কুঠীরের কথা অনেকবার স্বামীর মুখে শুনিয়াছিল। এক্ষণে তাহাকেও সেই স্থানে অবস্থান করিতে হইবে শুনিয়া, ভয়ে হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। সহসা তারাসর্দ্দারের কথা মনে পড়িল। এক লম্ফে দস্যুপতির নিকটবর্ত্তিনী হইয়া, মৃদুস্বরে ডাকিল, "সর্দ্দার!"

সর্দ্দার সেইরূপ অবস্থায় শুইয়াই উত্তর করিল, "বিবি!"

বিবি কহিল, "সর্দ্দার, সকলই শুনিয়াছ, সকলই জানিয়াছ, আমার উদ্ধারের কি কোন উপায় নাই? আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম, আমায় রক্ষা কর। সে স্থানে যাইলে আমি প্রাণে বাঁচিব না। কোন্ দিন রাত্রে কাটিয়া আমায় নদীর জলে ভাসাইয়া দিবে।"

সর্দ্দার কহিল, "ভয় নাই বিবি! তরাসর্দ্দারের শরণ লইয়া কেহ কখনও বিপদে পড়ে নাই। আমি তোমায় রক্ষা করিব।"

রৌশিনারা আশ্বস্তা হইল। খাঁসাহেব গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন, পশ্চাৎ দুইজন বিশ্বস্ত খোজা। তাহারা গৃহপ্রবেশ করিয়া, বিনা বাক্যব্যয়ে রৌশিনারার নিকটবর্ত্তী হইল এবং তাহার চীৎকার করিবার পূর্ব্বে তাহাকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া, মুখ এবং হস্তপদ বাঁধিয়া ফেলিল। খাঁ সাহেবের ইঙ্গিত মত রৌশিনারাকে স্কন্ধে তুলিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

দস্যু-আবাসে।

অনুচরদ্বয় রৌশিনারাকে লইয়া প্রস্থান করিলে, গোলাম মীর মহম্মদ খাঁ কক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিয়া পর্য্যঙ্কের উপর উপবেশন করিলেন। পত্নীর এই প্রকার আচরণে মর্ম্মাহত হইয়া বৃদ্ধ রোদন করিতে লাগিলেন। পরিণত বয়সে যুবতীর পাণিগ্রহণ করিয়া যে, অন্যায় করিয়াছেন, সে বিষয়ে এখন অনেকটা তাঁহার উপলব্ধি জন্মিল। আপন অবিমৃষ্যকারিতার জন্য আপনাকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন।

সহসা পর্য্যঙ্কের পার্শ্বস্থিত উপাধানগুলি নড়িয়া উঠিল। খাঁ সাহেব ভয়বিহ্বল হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার মুখ হইতে কোন কথা বাহির হইবার পূর্ব্বে, দস্যুপতি তারা সর্দ্দার তাঁহার সম্মুখে কৃতান্ত সহচরের ন্যায় দণ্ডায়মান হইল এবং অসি কোষমুক্ত করিয়া তীব্রস্বরে কহিল, "খাঁ সাহেব! চীৎকার করিও না। চীৎকার করিলে বিপদ ঘটিবে।"

খাঁ সাহেব ভয়বিমূঢ় হইয়া থর থর কাঁপিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখ দিয়া কোন বাঙ্নিষ্পত্তি হইল না। তারাসর্দ্দার আর দ্বিরুক্তি না করিয়া, অবাধে ধীর মন্থর-গমনে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

খাঁ সাহেব তারা সর্দারকে কখনও চক্ষে দেখেন নাই, সুতরাং তাহাকে চিনিতে পারিলেন না। তাহার প্রস্থানের পর প্রকৃতিস্থ হইয়া, বাটীর দাস-দাসীদিগকে ডাকিলেন, সকলে উপস্থিত হইল, আলোক লইয়া, অনেক অনুসন্ধান করিলেন কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না।

এদিকে খাঁ সাহেবের অনুচরদ্বয় রৌশিনারাকে লইয়া নন্দীগ্রামের অভিমুখে চলিল। মামুদপুর এবং নন্দীগ্রামের মধ্যে ব্যবধান সামান্য। উভয় স্থানের মধ্যে একটী সামান্য বন। বন পার হইলেই নন্দীগ্রামের কুঠীতে পৌছান যায়। তাহারা যখন বনপথ অতিক্রম করিয়া কুঠীর উপকণ্ঠে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, ঠিক সেই সময়ে দুই জন লোক তাহাদের পথ অবরোধ করিয়া দণ্ডায়মান হইল। বাহকদ্বয় ভীত হইয়া এক পার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইল। অবরোধকারীদ্বয়ের মধ্যে একজন কহিল, "যদি প্রাণের প্রতি মমতা থাকে, স্ত্রীলোককে এই স্থানে রাখিয়া প্রস্থান কর।"

বাহকদ্বয় ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। পথাবরোধকারী তরবারে হস্তার্পণ করিয়া কহিল, "কি! আমার কথা গ্রাহ্য হইল না—তবে মর।"

বাহকদ্বয় রৌশিনারাকে সেই স্থানে ফেলিয়া বেগে পলায়ন করিল। রৌশিনারার বন্ধন মুক্ত হইলে, কহিল, "সর্দার! আজ আমায় বড় বিপদ হইতে রক্ষা করিলে। তোমার ঋণ অপরিশোধ্য।"

তারা সর্দার খাঁ সাহেবের বাটী হইতে বহির্গত হইয়া, যমুনার তীরে আসিল এবং একটী সিস দিবামাত্র বৃক্ষের

অন্তরাল হইতে দুইজন বাহির হইয়া আসিল। একজনকে নৌকা লইয়া প্রস্থান করিতে বলিয়া অপরের সহিত রৌশিনারার উদ্ধারের জন্য ধাবিত হইল।

রৌশিনারা পুনরায় কহিল, "কিন্তু সর্দার! এখন আমার উপায় কি হইবে? আমি কোথায় আশ্রয় পাইব?"

সর্দ্দার কহিল, "তুমি আপাততঃ আমাদের আড্ডায় চল। পরে গিয়াস উদ্দিনকে সংবাদ দিব। তিনি তোমার উপায় করিবেন।"

রৌশিনারা দস্যুর আবাসে অবস্থানের কথা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিল। তারা সর্দ্দার তাহার মনোগত ভাব অবগত হইয়া কহিল, "সুন্দরি! সে ভয় নাই। আমরা দস্যু সত্য কিন্তু আশ্রিতের প্রতি কখনও কুব্যবহার করি না।"

রৌশিনারা অপ্রতিভ হইয়া কহিল, "সর্দার! আমায় ক্ষমা কর। চল, আমি তোমাদের আড্ডাতেই থাকিব।" তখন তিন জনে শৈলপুরের অভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। কিয়দ্দূর আসিয়া তারাসর্দার হঠাৎ থামিল এবং রৌশিনারার দিকে ফিরিয়া কহিল, "রৌশিনারা! আমরা কোন অপরিচিতকে আমাদের আবাসে লইয়া যাইবার পূর্ব্বে, তাহার চক্ষু বন্ধন করিয়া লইয়া যাই। সুতরাং তোমারও চোখ বাঁধিয়া দিব।"

রৌশিনারা সম্মত হইল। সর্দ্দার তাহার চোখ বাঁধিয়া, তাহার হাত ধরিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে সকলে একটী নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিল। অনুভবে রৌশিনারার বোধ হইতে লাগিল, সে স্থানটী নিবিড় জঙ্গলময়! তারাসর্দ্দার

তাহার হাত ধরিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। রৌশিনারার বোধ হইতে লাগিল, যেন তাহারা কোন স্থানের প্রস্তর অপসারিত করিয়া ভূগর্ভের মধ্যে অবতরণ করিতেছে। পদস্পর্শে বোধ হইতে লাগিল, স্থানটী প্রস্তরময়। নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া তারাসর্দ্দার রৌশিনারার চোখের আবরণ খুলিয়া দিল। রৌশিনারা দেখিল, সে একটী বিস্তৃত কক্ষের মধ্যে উপস্থিত। গৃহের সাজ-সজ্জা দেখিয়া তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল। অনেক রাজা-রাজড়ার ঘরেও এত বিভব—এত সৌন্দর্য্য নাই।

রৌশিনারার অবস্থানের জন্য একটী ক্ষুদ্র সজ্জিত কক্ষ নির্দ্দিষ্ট হইল। তারাসর্দ্দার অপর কক্ষে প্রস্থান করিল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

যমুনা ও তারাসর্দ্দার।

অদ্য রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় দস্যুপতি তারাসর্দ্দারের জমিদার বাটীতে ডাকাতি করিতে আসিবার কথা। সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতেই আকাশে অল্প অল্প মেঘ দেখা যাইতে লাগিল। সন্ধ্যার অন্ধকার ধরণীবক্ষে যতই ঘনীভূত হইতে লাগিল, আকাশের অবস্থা ততই যেন ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতে লাগিল। কোথা হইতে রাশি রাশি স্তূপীকৃত কাল মেঘ আসিয়া গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। সে মেঘস্তূপে নক্ষত্র, চন্দ্রমা, আকাশের নীলিমা সকলই ঢাকা পড়িল। শস্যশ্যামলা সুন্দরী প্রকৃতি ঘোরা মসীময়ী হইয়া এক বীভৎস মূর্ত্তি ধারণ করিল। মুহূর্ত্তের জন্য সকলই নীরব, নিস্তব্ধ। বায়ুর অব্যাহতগতি প্রতিহত। বিশ্ববাসী ভয়াকুল হইয়া স্ব স্ব আবাসে অবস্থিত।

দেখিতে দেখিতে অল্প অল্প বাতাস বহিল—বৃক্ষশিরে পত্রপুঞ্জ ঈষদান্দোলিত হইল—শুষ্কপত্র ঝরিয়া বাতাসে উড়িতে উড়িতে দূর দূরান্তরে পড়িল। ক্রমশঃ বায়ুপ্রবাহের গতি বাড়িতে

লাগিল। ধূলিরাশি উড়িয়া দিঙ্মণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। মেঘমালা প্রভঞ্জনবেগে অনন্তাকাশে ইতস্ততঃ প্রধাবিত হইতে লাগিল। মুহুর্মুহু দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া, ভয়াকুল জীব কুলকে সন্ত্রস্ত করিয়া, মসীময়ী অনন্ত প্রকৃতির আকাশ-প্রাঙ্গণে ছুটাছুটি করিতে লাগিল।

ঝটিকার সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি আসিল। অল্প অল্প ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি। ক্রমশঃ রাত্রি যত বাড়িতে লাগিল, ঝটিকার কোপও ততই প্রবল হইতে লাগিল। পথঘাট লোকশূন্য—যে যাহার ঘরে নীরবে উপবিষ্ট।

রাত্রি দেড় প্রহরের সময় প্রবলবেগে বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইল—ঝটিকার বেগও ঈষৎ প্রশমিত হইল। জমিদারবাটীর সকলে আহারাদি করিয়া, যে যাহার নির্দ্দিষ্ট কক্ষে শয়ন করিল। যমুনা সরসীকে ইঙ্গিতে বিদায় করিল—সে আপন প্রকোষ্ঠে আসিয়া শুইল। যমুনা কক্ষমধ্যে আলোক জ্বালিয়া কয়েকখানি কাগজে কি লিখিল, সেগুলি উত্তমরূপে বস্ত্রের মধ্যে লুকাইয়া, আলোকহস্তে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। ধীরপদে ইতস্ততঃ সতর্কদৃষ্টি সঞ্চালন করিতে করিতে নীচে নামিয়া আসিল। নিমচাঁদ যে কক্ষে শয়ন করিত, বাহির হইতে তাহার দ্বারে তালা বন্ধ করিয়া দিল। তাহার পর খিড়কির দ্বার মুক্ত রাখিয়া, সিঁড়ির পার্শ্বস্থ একটী কক্ষে অপেক্ষা করিতে লাগিল। আলোকটী নির্ব্বাণপ্রায় করিয়া, একটী ধামা ঢাকিয়া রাখিল। কক্ষ অন্ধকার—বাহিরে এখনও ঝড় বহিতেছে, বৃষ্টি পড়িতেছে—যমুনা নিবিড়ান্ধকার প্রকোষ্ঠ মধ্যে একাকিনী বসিয়া, কাহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

রাত্রি দ্বিপ্রহরের কিছু পূর্ব্বে বৃষ্টি থামিয়া গেল—ঝড়ের গতি মন্দীভূত হইয়া আসিলেও, বাতাস এখনও বেশ বেগে বহিতেছে। ধরণীবক্ষ, আকাশমণ্ডল এখনও পূর্ব্বের ন্যায় ঘনীভূত স্তূপীকৃত অন্ধকার রাশিতে আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে।

রাত্রি দ্বিপ্রহর। প্রকৃতি ভয়ঙ্করী, মসীময়ী। যমুনা নির্জ্জন-কক্ষে একাকিনী উপবিষ্টা। সহসা সোপানাবলীতে পদশব্দ এবং মনুষ্যকণ্ঠের অস্পষ্ট শব্দ শ্রুত হইল। যমুনা নীরব।

তারাসর্দ্দার দুইজন মাত্র সহচরের সহিত সিঁড়ির উপর দণ্ডায়মান। সহচরের মধ্যে একজন পাঠকের পরিচিত গোরাচাঁদ, অপর মাণিকলাল। গোরাচাঁদ কহিল, "কৈ, নিমচাঁদ কোথায়? এখনও কেন আসিতেছে না?"

সর্দ্দার কহিল, "আসুক আর না আসুক, যে কার্য্যে আসিয়াছি, তাহা সম্পাদন না করিয়া যাইব না।"

তিনজনে অগ্রসর হইল। পুনরায় সর্দ্দার কহিল, "যে কক্ষে ধনরত্ন লুকাইত আছে, সে কক্ষ আমি সহজেই অনুসন্ধান করিয়া লইতে পারিব। এস, আমার সঙ্গে এস।"

যমুনা যে কক্ষে অবস্থিত, দস্যু কয়েকজন সেই কক্ষদ্বারে উপস্থিত হইবামাত্র, সহসা সেই স্থান আলোকিত হইয়া উঠিল। চমকিত হইয়া দস্যুরা দেখিল, আলোকহস্তে এক অপূর্ব্ব সুন্দরী কক্ষদ্বারদেশে দণ্ডায়মান। গোরা ভীত হইয়া, তরবারে হস্তার্পণ করিয়া কহিল, "নিমে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে!"

তারাসর্দ্দার সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া, সাশ্চর্য্যে কহিল, "একি! এও কি সম্ভব! সেই রমণী—"

বাধা দিয়া গোরা কহিল, "কোন্ রমণী? যে সে দিন উদ্যানমধ্যে সেই স্ত্রীলোককে হত্যা করিয়াছিল?"

তারা। হাঁ! সেই কামিনীই বটে। ইহারই অস্ত্রাঘাতে সেই কিশোরীর জীবনান্ত ঘটিয়াছে।

যমুনা বস্ত্রের মধ্য হইতে একখণ্ড কাগজ বাহির করিয়া, দস্যুপতির হাতে দিয়া পড়িতে ইঙ্গিত করিল। তারাসর্দ্দার কাগজখানি লইয়া, সঙ্গীগণকে শুনাইয়া পড়িল:—

"আমার নাম যমুনা—বর্ত্তমান জমিদারের সহোদরা। আমি কালা এবং বোবা, বোধ হয়, লোকমুখে তুমি শুনিয়া থাকিবে। আমি কথা কহিতে পারি না, সেই জন্য কাগজে লিখিয়া আমার মনোভাব তোমায় জ্ঞাপন করিতেছি। তোমাদের অভিপ্রায় আমি কোনরূপে জ্ঞাত হইয়াছি। নিমচাঁদ তোমাদিগকে মিথ্যা কথা বলিয়াছে—সে কক্ষে কোন ধনবস্তু নাই। থাকিলেও আমি স্থানান্তরিত করিতাম। যদি তোমরা আমার কোন কার্য্য সম্পাদন করিতে পার, আমি তোমাদিগকে যথেষ্ট পুরস্কৃত করিব।"

গোরাচাঁদ কহিল, "নিমচাঁদ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে, সেই জন্য সে আমাদের সহিত মিলিত হয় নাই।"

তারাচাঁদ বলিল, "সে নিশ্চয়ই তাহার পাপের ফল ভুগিবে। এখন উপস্থিত টাকাটা ছাড়া কর্ত্তব্য নয়। টাকা না পাইলেও, সুন্দরীর মনস্তুষ্টির জন্য আমি সকল কার্য্য করিতেই প্রস্তুত।"

গোরা। ইহার কথায় বিশ্বাস কি! টাকার প্রলোভন দেখাইয়া আমাদিগকে বিপন্ন করিতে পারে।

তারা। তাহা পারিবে না। আমাদিগকে বিপন্ন করিতে

গেলে, নিজেকেও বিপন্ন হইতে হইবে। সুন্দরীর সুন্দর হস্ত নররক্তে কলঙ্কিত—,আমরাও সে কথা প্রকাশ করিয়া, তাহাকে বিপন্ন করিতে পারিব।

তাহার পর তারাসর্দ্দার যমুনার দিকে ফিরিয়া, মস্তকাবনত করিয়া সম্মতি জানাইল। যমুনা তাহাদিগকে পশ্চাদনুসরণ করিতে ইঙ্গিত করিয়া অগ্রসর হইল।

সকলে যমুনার কক্ষমধ্যে উপস্থিত হইল। যমুনা দ্বার রুদ্ধ করিয়া, দ্বিতীয় কাগজখানি, সর্দ্দারের হাতে দিল। সর্দ্দার পড়িতে লাগিল :—

"আমাদের বাড়ীতে সরসী নাম্নী একটী কিশোরী বাস করে। তাহাকে বন্দিনী করিয়া কোন স্থলে লুকাইয়া রাখিতে হইবে। আমার দ্বিতীয় আদেশ ব্যতীত তাহাকে ছাড়িয়া দিবে না। কিংবা আমি ইহার মধ্যে আছি, তাহাকে বলিবে না। যদি স্বীকার হও, পাঁচশত টাকা আপাততঃ দিব এবং ছাড়িয়া দিবার পর আর পাঁচশত দিব।"

দস্যুপতি পুনরায় অভিবাদনপূর্ব্বক সম্মতি জ্ঞাপন করিল। তাহার পর যমুনা আর একখানি কাগজ তাহার হস্তে দিল। সর্দ্দার পুনরায় পাঠ করিল :—

"কোন একটী স্ত্রীলোকের হত্যাপরাধে ব্রজেন্দ্র নামক একজন লোক বন্দী হইয়া করাগারে আছে। আগামী পরশ্ব তাহার বিচার হইবে। যদি বিচারে মুক্তি পায়, তোমাদের সাহায্যের আর আবশ্যক হইবে না। নন্দীগ্রামে ফৌজদারের নিকটেই তাহার বিচার হইবে। বিচারে দোষী সাব্যস্ত হইলে, তাহাকে আর তথায় রাখিবে না। প্রহরীবেষ্টিত করিয়া

সুবায় প্রেরণ করিবে। শুনিয়াছি, তোমরা সাহসী এবং তোমাদের দলেও অনেক লোক আছে। যদি পথিমধ্যে প্রহরীদের নিকট হইতে ব্রজেন্দ্রকে মুক্ত করিতে পার, তোমাদিগকে হাজার টাকা দিব। এখন অগ্রিম পাঁচ-শত দিতেছি। যদি তোমাদের সাহায্যের আবশ্যক হয়, কার্য্যান্তে আরও পাঁচ শত দিব, নচেৎ দিব না।"

দস্যুপতি পুনরায় সম্মতি জ্ঞাপন করিল। গোরাচাঁদ কহিল, "কিন্তু সর্দ্দার! এ কার্য্য বড়ই বিপজ্জনক।"

তারা। হোক বিপজ্জনক। এই সুন্দরীর আদেশ আমার শিরোধার্য্য। টাকা না পাইলেও আমি তাহার কার্য্য উদ্ধার করিয়া দিতাম।

যমুনা পুনরায় আর একখণ্ড কাগজ সর্দ্দারের হাতে দিল। সর্দ্দার পূর্ব্ববৎ পড়িল :—

"কাল রাত্রি এক প্রহরের পর, তোমাদের মধ্যে যে কেহ, তমালতলায় অপেক্ষা করিবে। কিরূপে কার্য্য করিতে হইবে, আমি কাগজে লিখিয়া বলিয়া দিব, কিন্তু সাবধান, আমার সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া নিস্তার পাইবে না।"

সর্দ্দার কহিল, "আমি স্বয়ং সাক্ষাৎ করিব।" তাহার পর মস্তক সঞ্চালন করিয়া ইঙ্গিতে সম্মতি জানাইল। যমুনা পাঁচ শত মুদ্রার দুটী তোড়া বাহির করিয়া দস্যুপতির সম্মুখে রাখিল। সর্দ্দারের ইঙ্গিতে গোরাচাঁদ এবং মাণিকলাল তোড়া দুইটী তুলিয়া লইল, যমুনা অপর একটা আলোক জ্বালিয়া, সর্দ্দারের হাতে দিয়া, গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। সর্দ্দার এবং অপর দুইজন দস্যুও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। পার্শ্বের একটী কক্ষে

সরসী শয়ন করিয়া থাকে। রাত্রে যমুনার পাছে কোন কিছুর আবশ্যক হয় বলিয়া, সরসী কক্ষ অর্গলাবদ্ধ করিয়া শয়ন করে না। অদ্যও কক্ষদ্বার সংযোজিত ছিল মাত্র। যমুনা ইঙ্গিতে কক্ষ দেখাইয়া দিয়া, সম্মুখ হইতে সরিয়া দাঁড়াইল। তারা সর্দ্দার গোরাচাঁদের হস্তে আলোক দিয়া নিঃশব্দে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। অভাগিনী সরসী গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত ছিল। তারাচাঁদ সহজেই তাহার মুখ এবং হস্তপদ বন্ধন করিয়া ফেলিল এবং ক্ষুদ্র বালিকাবৎ তাহাকে স্কন্ধে তুলিয়া কক্ষ হতে নিষ্ক্রান্ত হইল। খিড়্কির দ্বার মুক্ত ছিল, তিনজনে অনায়াসে বাহির হইয়া গেল। যমুনা নিশ্চিন্তে আপন প্রকোষ্ঠে আসিয়া শয়ন করিল।
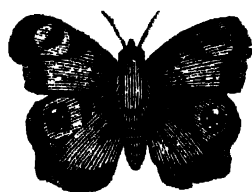
ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

তমালতলে।

পরদিবস প্রাতঃকালে জমিদারবাটীতে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। যমুনার সহচরী সরসী রাত্রির মধ্যে অদৃশ্য। যত বেলা বাড়িতে লাগিল, পুরবাসীগণের উৎকণ্ঠাও তত বৃদ্ধি হইল। অজয়ের মুখ শুখাইল, মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। সহসা তাহার অন্তর্ধ্যানের কোন কারণ অনুসন্ধান করিয়া পাইলেন না, সরসী কি যমুনার অত্যাচারে উত্যক্তা হইয়া পলায়ন করিয়াছে? তাই বা কিরূপে সম্ভবে? তাহা হইলে, যাইবার পূর্ব্বে কি একবারও অজয়কে বলিয়া যাইত না। অজয় কিছুই মীমাংসা করিতে পারিলেন না। যদি কোন পত্রাদি রাখিয়া গিয়া থাকে, ভাবিয়া, তিনি সরসীর কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, তাহার শয্যা বিপর্য্যস্ত, গৃহতলে কর্দ্দমাক্ত পদচিহ্ন। তখন তাঁহার মনে ঘোর সন্দেহ জন্মিল। তবে কি সরসী অপহৃত হইয়াছে, কোন কুচক্রীর ষড়যন্ত্রে পড়িয়া বিপন্ন হইয়াছে? নিশ্চয়ই। তিনি আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। তৎক্ষণাৎ তাহার অনুসন্ধানে চারিদিকে লোক প্রেরিত হইল,

ফৌজদারের নিকটও সংবাদ পাঠাইলেন। সমস্ত দিন অনুসন্ধান চলিল, কিন্তু কোন ফলই ফলিল না।

যমুনা নীরবে অজয়ের কার্য্যকলাপ দেখিতে লাগিল। অজয়ের দুঃখ দেখিয়া, তাহার হৃদয় ফাটিতে লাগিল। কিন্তু যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সরসীরে স্থানান্তরিত করিয়াছে, তাহাতে ভবিষ্যতে অজয়ের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইবে ভাবিয়া, যমুনা নীরবে সকলই সহ্য করিয়া রহিল।

সন্ধ্যা হইল। অজয় আপন কক্ষে নির্জ্জনে বসিয়া সরসীর জন্য অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। সরসী দরিদ্রের কন্যা হইলেও, বিপুল ধনসম্পত্তির অধীশ্বর অজয় তাহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসিয়াছেন—তাহার বিচ্ছেদে, তাহার অনিষ্টাশঙ্কা করিয়া অজয় প্রতিমুহূর্ত্তে অধিকতর কাতর এবং পরিম্লান হইতে লাগিলেন। শেষে ভাবিতে ভাবিতে শয্যায় শুইয়া পড়িলেন, সে রাত্রে আর তাঁহার আহারাদি হইল না।

এ দিকে যমুনা আপন কক্ষে বসিয়া একখণ্ড কাগজে কি লিখিল। তাহার পর বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া দিব্য যুবক সাজিল। কাগজখানি অঙ্গবস্ত্রের মধ্যে লুকাইয়া, একখানি শাণিত ছুরিকা গ্রহণ করিল। তাহার পর গুপ্তদ্বারের সাহায্যে উদ্যানের মধ্য দিয়া রাস্তায় বাহির হইল।

রাত্রি অল্পালোকময়ী। আকাশে নক্ষত্র আছে, চন্দ্রমা আছে, কিন্তু চন্দ্রমার কিরণ পরিস্ফুট হইয়া পৃথ্বীতলে পড়িতেছে না। শ্বেতাম্বুদখণ্ডসমূহ ধীরপবনসঞ্চালিত হইয়া, বারিধির নীলাম্বুরাশির উপর শুভ্র ফেনপুঞ্জবৎ, ইতস্ততঃ পরিচালিত হইতেছে—সুধাংশুকে সমাচ্ছাদিত করিয়া, পরিস্ফুট আলোকময়ী

রজনীকে প্রভাতের ন্যায় পরিম্লান করিতেছে। যমুনা ক্রমশঃ নগরের উপকণ্ঠে আসিয়া উপস্থিত হইল। নির্ভীকা যুবতী প্রশস্ত রাজ-বর্ত্ম ত্যাগ করিয়া, সংকীর্ণ লোকসমাগমশূন্য পথ ধরিয়া প্রান্তরের সমীপবর্ত্তিনী হইল। শৈলপুরের উপকণ্ঠে রায়েদের ভগ্নাট্টালিকা। রায়-পরিবার সর্ব্বধ্বংসী কালগ্রাসে বহুকাল নিপতিত হইয়াছে। তাহাদের বসতবাটী, মানবহৃদয়ে শোকস্মৃতির ন্যায়, শৈলপুর বক্ষে বিরাজিত রহিয়াছে। অট্টালিকা ভগ্ন—ইষ্টকরাশি স্তূপীকৃত—সাধের উদ্যান বনজঙ্গলে পূর্ণ। নিকটের মধ্যে অপর কোন লোকের বসতি নাই। এই বাটীর সম্মুখে একটী তমালবৃক্ষ। গাছটী বহুকালের। দিনের বেলায় রাখালেরা মাঠে গোমেষাদি ছাড়িয়া, ইহার ঘন পত্রাচ্ছাদিত ছায়াশীতল মূলে উপবেশন করিয়া, মনের আনন্দে গীত গায়। সন্ধ্যার পর এ অঞ্চলে বড় একটা লোকের সমাগম হয় না।

যমুনা রাত্রি ঠিক এক প্রহরের সময়ে এই তমালবৃক্ষের মূলে আসিয়া উপস্থিত হইল। দস্যুপতি তারাসর্দ্দার বা তাহার কোন অনুচরকে তথায় সমুপস্থিত না দেখিয়া কিছু উদ্বিগ্ন হইল। কিন্তু তাহাকে অধিকক্ষণ এরূপভাবে অবস্থান করিতে হইল না। অবিলম্বে তারাসর্দ্দার তাহার সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। যমুনা কাগজখানি বাহির করিয়া তাহাকে দিবার জন্য হাত বাড়াইল। এই সময়ে পশ্চাতে কাহার পদশব্দ হইল। যমুনা মুখ ফিরাইয়া দেখিল, দুইজন লোক তাহার পশ্চাতে দণ্ডায়মান। তাহার মনে ঘোর সন্দেহ জন্মিল, বস্ত্রমধ্যে লুক্কায়িত শাণিত ছুরিকা বাহির করিল,

কিন্তু ছুরিকা উত্তোলন করিবার পূর্ব্বেই তারাসর্দ্দার ছুরিসমেত হস্তখানি ধরিয়া, ছুরিখানি কাড়িয়া লইল। যমুনা দস্যুকবল হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য বিস্তর প্রয়াস পাইল, কিন্তু শক্তিশালী দস্যুত্রয়ের নিকট তাহার চেষ্টা বিফল হইল। তিন জনে তাহাকে ধরাধরি করিয়া, প্রান্তর পার হইয়া, নদীতটে আসিয়া উপস্থিত হইল। একখানি ক্ষুদ্র পানসী ঘাটে বাঁধা ছিল, যমুনাকে তাহার উপর তুলিয়া দস্যুরা নৌকা ছাড়িয়া দিল।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

বিচারে মুক্তি।

আজি ব্রজেন্দ্রের বিচার। কাজি সাহেবের আগমনের বহু পূর্ব্ব হইতেই বিচারালয় লোকে লোকারণ্য। সকলেই হত্যাব্যাপারের পরিণাম ফল জানিবার জন্য উদ্‌গ্রীব।

যথাসময়ে কাজি সাহেব আসিয়া বিচারাসনে উপবেশন করিলেন। প্রথমেই ব্রজেন্দ্রের বিচার আরম্ভ হইল। কোতয়াল শৃঙ্খলাবদ্ধ ব্রজেন্দ্রকে কাজি সাহেবের সম্মুখে হাজির করিলেন। মুন্সি খাতা খুলিয়া মোকদ্দমার স্থূল মর্ম্ম কাজি সাহেবকে বুঝাইয়া দিলেন।

কাজি সাহেব ব্রজেন্দ্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "বন্দি! তোমার নাম কি?"

ব্রজেন্দ্র। ব্রজেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

কাজি। পিতার নাম?

ব্রজেন্দ্র। হরগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

কাজি। নিবাস?

ব্রজেন্দ্র। আপাততঃ শৈলপুরে।

কাজি। পূর্ব্বে কোথায় ছিলে ?

ব্রজেন্দ্র। হরিবল্লভপুরে।

কাজি। তোমার আর কে আছে ?

ব্রজেন্দ্র। কেহ নাই।

কাজি। তোমার উদ্যানমধ্যে যে স্ত্রীলোকটী হত্যা হইয়াছে, তাহাকে তুমি চেন ?

ব্রজেন্দ্র। চিনি।

কাজি। তাহার সহিত তোমার সম্বন্ধ কি ?

ব্রজেন্দ্র নীরব।

কাজি সাহেব পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কি তোমার উপপত্নী ?"

ব্রজেন্দ্র। ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া বলিতেছি, না।

কাজি। তবে কি তোমার স্ত্রী ?

ব্রজেন্দ্র। না।

কাজি। তাহার নাম কি ?

ব্রজেন্দ্র। অলকা।

কাজি। প্রহরীর মুখে তোমার উদ্যানমধ্যে নরহত্যা হইয়াছে শুনিয়া, তুমি কি প্রকারে জানিলে সে অলকা ?

ব্রজেন্দ্র। আমি রাত্রিতে বাড়ী ছিলাম না। প্রত্যুষে যখন প্রত্যাবর্ত্তন করি, তখন অলকার সহিত উদ্যানে আমার সাক্ষাৎ হয়। প্রহরীর মুখে যখন শুনিলাম, আমার উদ্যান মধ্যে নরহত্যা ঘটিয়াছে, তখন স্বতঃ আমার ধারণা জন্মিল, অলকাই হত্যা হইয়াছে।

কাজি। তুমি রাত্রিতে কোথায় ছিলে ?

ব্রজেন্দ্র পুনরায় নীরব রহিলেন। কাজি কহিলেন, "তুমিই তাহা হইলে অলকাকে হত্যা করিয়াছ?"

ব্রজেন্দ্র। ঈশ্বরের নামে শপথ করিয়া বলিতেছি, আমার হস্তে অলকার মৃত্যু ঘটে নাই।

কাজি। তোমার বস্ত্রে রক্তের দাগ কিরূপে লাগিল?

ব্রজেন্দ্রের মুখ শুখাইল। ব্রজেন্দ্র দেখিলেন, সত্য কথা প্রকাশ না করিলে, ঘটনাচক্রে পড়িয়া, তাঁহাকে অলকার হত্যাকারী হইতে হইবে। তাঁহার বিরুদ্ধে যে সকল প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা ক্ষালন করিবার শক্তি তাঁহার নাই। অলকা তাঁহার সহোদরা ভগ্নী, এ কথা প্রকাশ্য বিচারালয়ে দাঁড়াইয়া প্রকাশ করা তাঁহার অভিপ্রেত নহে। তাঁহাকে চিন্তিত দেখিয়া কাজি সাহেব কহিলেন, "বন্দি! তোমার বিরুদ্ধে যে অখণ্ডনীয় প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে তোমার যদি কিছু বলিবার থাকে, বলিতে পার।"

ব্রজেন্দ্র ধীর গম্ভীর-স্বরে কহিলেন, "সত্য কথা বলিলে কি আপনি বিশ্বাস করিবেন?"

কাজি। তোমার উক্তির সত্যতা যদি সপ্রমাণ করিতে পার, অবশ্য বিশ্বাস করিব। তোমার বস্ত্রে কিসের রক্ত?

ব্রজেন্দ্র। মানুষের।

কাজি। অলকার?

ব্রজেন্দ্র। না, কোন দস্যুর।

ব্রজেন্দ্র দস্যুঘটিত তাবৎ বিষয় প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "যদি আমার কথায় অবিশ্বাস করেন, বনমধ্যে কোন বিশ্বাসী লোক পাঠাইয়া দিন, এখনই আমার কথার সারবত্তা প্রমাণিত

হইবে। সম্ভবতঃ দস্যুর মৃতদেহ এখনও সেই স্থানে পতিত আছে। যদিও দেহ ইতিমধ্যে বন্যজন্তু কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়া থাকে, আমার নামাঙ্কিত কিরিচ এবং টাকার তোড়া সেই স্থানে পতিত লক্ষিত হইবে।"

সেই দণ্ডেই একজন কর্ম্মচারী অশ্বারোহণে ব্রজেন্দ্রবর্ণিত বনাভিমুখে ধাবিত হইল। সে দিনের মত বিচার স্থগিত রহিল, ব্রজেন্দ্র পূর্ব্ববৎ হাজতে প্রেরিত হইলেন।

পরদিবস যথাসময়ে ব্রজেন্দ্র কাজি সাহেবের সম্মুখে আনীত হইলেন। কর্ম্মচারী বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া, অনেক অনুসন্ধানের পর কিরিচ এবং টাকার তোড়াটী আনিয়াছিল। মৃতদেহ বন্যপশু কর্ত্তৃক ছিন্নভিন্ন এবং ভক্ষিত হইয়াছে। কাজি সাহেব কর্ম্মচারীর মুখে সকল কথা শুনিয়া, বন্দীকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "তুমি পূর্ব্বে বনমধ্য হইতে কত টাকা আনিয়াছ?"

ব্রজেন্দ্র প্রকৃত কথা কহিলেন। পুনরায় কাজি সাহেব জিজ্ঞাসিলেন, "তাহা হইলে, তোমার বর্ত্তমান বিভবের সমস্তই দস্যুপ্রদত্ত?"

ব্রজেন্দ্র এবারও সত্য কহিলেন। কাজিসাহেব কহিলেন, "তোমাকে মুক্তি দিলাম, কিন্তু তোমার অস্থাবর যা কিছু সম্পত্তি আছে, সমস্তই রাজসরকারে জমা হইবে। দস্যুর অর্থ রাজারই প্রাপ্য—সে তোমাকে দিয়া গেলেও, তোমার সমস্ত রাজকোষে জমা দেওয়া উচিত ছিল। অস্থাবর সম্পত্তি কেবল আমি দয়াপরবশ হইয়া তোমাকে ভোগদখল করিতে দিলাম।"

ব্রজেন্দ্র মুক্তি পাইলেন, কিন্তু কাজিসাহেবের অপূর্ব্ব বিচারলীলায় এবং তাঁহার দয়াপরবশতায় সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না।

তাঁহার বন্ধন খুলিয়া দেওয়া হইল। ব্রজেন্দ্র পুনরায় পথের ভিখারী হইলেন। ফৌজদারের আদেশে তাঁহার সমস্ত ধনরত্ন এবং গৃহসজ্জা প্রভৃতি বাজেয়াপ্ত হইল। কেবল বাটীখানি তাঁহার রহিল। ব্রজেন্দ্র শূন্যগৃহে আর প্রবেশ করিলেন না। যমুনার সহিত সাক্ষাতের জন্য জমিদারবাটীর অভিমুখে চলিলেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

নানা ঘটনা।

ব্রজেন্দ্র জমিদার-বাটীতে আসিয়া যাহা শুনিলেন, এবং যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। সরসী এবং যমুনা অভূতপূর্ব্ব উপায়ে নিরুদ্দিষ্টা। পরিজনবর্গ শোকাকুল, মর্ম্মাহত। অজয়কুমার কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়, শোকে জ্ঞানশূন্য।

ব্রজেন্দ্র দেখিলেন, সংসারে তাঁহার সুখ নাই। প্রথম জীবনে দরিদ্রতার কঠিন নিপীড়নে যারপরনাই কষ্ট পাইয়াছেন, মধ্যে দিন কয়েকের জন্য সুখের আস্বাদ পাইয়াছিলেন মাত্র, কিন্তু বিরূপ ভাগ্যলিপির প্রবর্ত্তনে জীবনের সুখশান্তি পুনরায় দুর্দ্দশার রাহুগ্রাসে কবলিত হইল। তমিস্রা রজনীর ঘোরান্ধকার মধ্যে মুহূর্ত্তের জন্য চপলা বিভাসিত হইয়া—মুহূর্ত্তের জন্য দিগঙ্গনা উদ্ভাসিত করিয়া, পুঞ্জীকৃত অন্ধকারমধ্যে কোথায় মিশিয়া গেল। দরিদ্রতানিষ্পেষিত, মর্ম্মপীড়িত ব্রজেন্দ্র দিনকতকের জন্য বিপুল ধনসম্পত্তির অধীশ্বর হইলেন—প্রাণের ভগিনী অলকাকে পাইলেন—কিন্তু ভাগ্যবিপর্য্যয়ে অলকা মরিল—ধনসম্পত্তি যেমন চক্ষের নিমিষে আসিয়াছিল, তেমনি

নিমেষমধ্যে চলিয়া গেল—তিনি পুনরায় সেই পথের ভিখারী হইলেন। মরুক অলকা—যা'ক ধনরত্ন—এখনও তবু একটা সান্ত্বনার স্থল আছে—এখনও তবু এমন একটা জিনিষ আছে, যাহাকে হৃদয়ে ধরিয়া, সন্তপ্তহৃদয়কে শান্ত করিতে পারিবেন। ব্রজেন্দ্র ছুটিয়া আসিলেন। আসিবামাত্র শুনিলেন, যমুনা নিরুদ্দিষ্টা।

ব্রজেন্দ্র হৃদয়ে দারুণ আঘাত পাইলেন। আঘাতের উপর আঘাত। মনুষ্য-হৃদয়ে কত আর সহ্য হয়। ব্রজেন্দ্র উন্মত্তবৎ সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

এদিকে দস্যুপতি যমুনাকে লইয়া, নৌকারোহণে প্রস্থান করিল। সমস্ত রাত্রি নৌকা বাহিয়া সূর্য্যোদয়ের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে এক বিজন বিপিনের নিকট উপস্থিত হইল। নৌকা তটে লাগিল। তারাসর্দ্দার যমুনাকে লইয়া তীরে অবতীর্ণ হইল। মাণিকলাল আলোকহস্তে অগ্রে অগ্রে চলিল। গোরা-চাঁদ নৌকাতেই রহিল।

অরণ্যানীর মধ্যস্থলে এক প্রকাণ্ড ভগ্নাট্টালিকা। পূর্ব্বে এ স্থলে যে লোকের বসতি ছিল, এখনও তাহার অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়। কালপ্রভাবে সকলই গিয়াছে। অনন্ত-শক্তি কালস্রোতে ধনধান্য ভাসিয়া গিয়াছে—নগরবাসী অনন্তে মিশিয়াছে—সৌধকিরীটিনী সৌন্দর্য্যময়ী নগরী মহারণ্যে পরিণত হইয়াছে। কেবল একখানিমাত্র অট্টালিকা জীর্ণাবস্থায় এখনও দাঁড়াইয়া আছে। তারাসর্দ্দার মাঝে মাঝে এ বিপিনে দল-বল লইয়া আসিয়া বাস করিত। কড়ি বরগা সরাইয়া, ইষ্টকস্তূপ পরিষ্কৃত করিয়া, বাটীর মধ্যে কয়েকটী ঘর ব্যব-

হারোপযোগী করিয়া লইয়াছিল। বাহিরের ঘরগুলি ভগ্ন এবং পতিত হইলেও, ভিতরের কয়েকটী প্রকোষ্ঠ বেশ ছিল। কড়ি-বরগা এবং ইষ্টকরাশি পড়িয়া এবং বনজঙ্গল জন্মিয়া ভিতরে প্রবেশের পথ রুদ্ধ হইয়াছিল। দস্যুপতি বহু পরিশ্রমে বনজঙ্গল কাটিয়া, ইষ্টক সরাইয়া পথ পরিষ্কার করিয়া লইয়াছিল। এক্ষণে যমুনাকে লইয়া এই বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। দ্বারে তালাবদ্ধ ছিল। চাবি খুলিয়া, যমুনাকে লইয়া একটী প্রকোষ্ঠমধ্যে প্রবিষ্ট হইল।

কক্ষের মধ্যস্থল বেশ পরিষ্কৃত এবং মনুষ্যবাসের উপযুক্ত। একাংশে শয্যাদিও রচিত ছিল। এতক্ষণ যমুনার হস্ত আবদ্ধ ছিল, গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া দস্যুপতি তাহার হস্তের বন্ধন মোচন করিয়া দিল।

কক্ষে অপরাপর দ্রব্যের মধ্যে অস্ত্রাদিও ছিল। যমুনার চঞ্চলদৃষ্টি তাহার উপর পড়িবামাত্র, ক্ষিপ্রহস্তে একখানি শাণিত ছুরিকা তুলিয়া লইল এবং ইঙ্গিতে দস্যুপতিকে কহিল, "যদি আমার নিকটবর্ত্তী হস্ বা আমায় স্পর্শ করিতে চেষ্টা পাস্, তাহা হইলে এই ছুরিকায় আত্মহত্যা করিব।"

দস্যুপতি আপন ভ্রম বুঝিল। কক্ষ হইতে অস্ত্রাদি অপসারিত না করিয়া, যমুনাকে সেখানে আনা ভাল হয় নাই।

যমুনা একাকিনী সেই প্রকোষ্ঠমধ্যে বাস করিতে লাগিল: তারাসদার সাহস করিয়া তাহার সমীপবর্ত্তী হইত না। যমুনা যাহা ইঙ্গিতে প্রকাশ করিয়াছে, কার্য্যে সম্পাদন করা, তাহার পক্ষে যে দুরূহ নয়, তাহা সে ভালরূপই জানিত। দস্যু-সর্দার সুসময়ের প্রতীক্ষায় রহিল:

যমুনা কক্ষের দ্বার ভিতর হইতে বন্ধ করিয়া রাখিত। বাহিরেও দস্যুপতি শিকল আঁটিয়া দিত। আহারাদি প্রস্তুত হইলে, শিকল খুলিয়া দ্বারে করাঘাত করিত, যমুনা দ্বার খুলিয়া দিত। মাণিকলাল আহার্য্যাদি দ্বারের নিকট রাখিয়া প্রস্থান করিত।

এইরূপে একপক্ষ কাটিল। তারাসর্দ্দার মাণিকলালের উপর যমুনার রক্ষণাবেক্ষণের ভারার্পণ করিয়া, গোরাচাঁদের সহিত শৈলপুরের নিকটবর্ত্তী আড্ডায় ফিরিয়া আসিল।

যমুনাকে রাখিয়া শৈলপুরে তারাসর্দ্দারের ফিরিবার অনেক-গুলি কারণ আছে। সেগুলি ক্রমশঃ প্রকাশ পাইবে।

আড্ডায় ফিরিয়াই দস্যুপতি সরসীকে মুক্ত করিয়া দিল। দস্যু-আবাসে সরসীর কোন অযত্ন হয় নাই। তারাচাঁদ সরসীর পরিচিত। সরসীদের বাটীর নিকট তাহার মাসীর বাড়ী। সরসীদের যখন সময় ভাল ছিল, তারাচাঁদ তাহাদের নিকট অনেক বিষয়ে সাহায্য পাইয়াছিল। আড্ডায় আসিয়া যখন সরসীর বন্ধনাদি খুলিয়া দেওয়া হইল, তারাচাঁদ তখন সরসীকে চিনিতে পারিল। তারাচাঁদের হৃদয় নিতান্ত অকৃতজ্ঞতায় পূর্ণ নহে। সরসীকে সম্বোধন করিয়া দস্যুপতি কহিল, "সরসী! তুই কাঁদিস্ না। তোর কোন ভয় নাই—কন্যা যেমন পিতার আলয়ে অসঙ্কোচে বাস করে, আমার এখানে তুইও সেইরূপ ভাবে থাক। কিছুদিন পরে আমি তোকে তোর পিসীর নিকট রাখিয়া আসিব। তুই জমিদার-বাটীতে আর যাস্ না—সেখানে তোর এক ভয়ঙ্কর শত্রু আছে।"

তাহার পর দলের সকলকে ডাকিয়া বলিয়া দিল, "সাব-

থান! সরসী যতদিন এখানে থাকিবে, যেন কোনরূপে তাহার কোন কষ্ট না হয়।”

অদ্য দস্যুপতি আড্ডায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়াই সর্ব্বপ্রথমে সরসীর নিকট গেল, এবং তাহাকে সঙ্গে করিয়া আড্ডা হইতে বহির্গত হইল। অবশ্য আড্ডা হইতে বহির্গত হইবার সময়ে, তাহার চক্ষু বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

যথাসময়ে সরসী তাহার পিসীর কুটীরের নিকট পৌঁছিল। সরসী দস্যুপতির নিকট বিদায় লইবার সময় ছলছলনেত্রে কহিল, “সর্দ্দার! তুমি দস্যু সত্য, কিন্তু অনেক ধর্ম্মাভিমানী অপেক্ষা তোমার হৃদয় উচ্চ। কাহার চক্রান্তে পড়িয়া আমি বন্দিনী হইয়াছিলাম, তাহা বুঝিয়াছি। যাহা হউক, যত দিন আমি জীবিত থাকিব, তোমার সদাশয়তা ভুলিতে পারিব না।”

তারাচাঁদ কোন উত্তর করিল না। মুখ ফিরাইয়া প্রস্থান করিল। সরসীও পিসীর কুটীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। হত-ভাগিনী বৃদ্ধা হারানিধি ঘরে পাইয়া, মনের আনন্দে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে লাগিল।

তারাচাঁদের দ্বিতীয় কার্য্য গিয়াসউদ্দিনের সহিত সাক্ষাৎ করা। তারাচাঁদ আড্ডায় ফিরিল। দিবা মুসলমান যুবকের বেশ ধরিয়া, মামুদপুরে গিয়াসউদ্দিনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিল।

এই কয়েক দিবসের মধ্যে সেনাপতি গিয়াসউদ্দিনের ভাগ্যের অনেক বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। সুবার ফৌজদার গোলাম মীর মহম্মদের পরম সুহৃদ। খাঁ সাহেব পত্নী এবং গিয়াস-উদ্দিন ঘটিত তাবৎ বিষয় তাঁহার কর্ণগোচর করিয়াছেন

দস্যুসর্দার রৌশিনারাকে তাঁহার অনুচরদ্বয়ের কবল হইতে উদ্ধার করিয়াছে, কিন্তু সে দোষও গিয়াসের স্কন্ধে আরোপিত হইয়াছে। বৃদ্ধ খাঁ সাহেব রৌশিনারা বিরহে কাতর হইয়া পড়িয়াছেন। রসবতী রৌশিনারা বৃদ্ধ খাঁ সাহেবের জরাজীর্ণ শুষ্কহৃদয়ের শান্তিতটিনী। তিনি এখন কলঙ্কিনী প্রণয়িনীকে ক্ষমা করিতে প্রস্তুত, তাহাকে পাইলে, তাহার পূর্ব্ব অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া তাহাকে হৃদয়ে ধরিতে ব্যাকুল। তিনি ফৌজদারের সহিত পরামর্শ করিয়া, গিয়াসের বিরুদ্ধে এক দারুণ অভিযোগ আনিয়াছেন। গিয়াস এখন রৌশিনারা অপহরণে অভিযুক্ত।

এদিকে ফৌজদার তাঁহার কর্ত্তব্যপালনে শৈথিল্য, প্রজাগণের উপর অত্যাচার এবং দ্যূতক্রীড়ায় একান্ত আসক্তির কথা বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তার গোচর করিয়াছেন। গিয়াসের বিপদ এখন চারিদিকে।

গিয়াস বিপদে অধৈর্য্য হইয়া পড়িয়াছেন। শীঘ্রই যে, তাঁহাকে কর্ম্ম হইতে অপসৃত এবং কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইবে, তাহা তিনি বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন। তাঁহার বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ উপস্থিত, তাহার ক্ষালন করা সহজসাধ্য নহে। স্বয়ং ফৌজদার তাঁহার বিরুদ্ধাচারী।

সন্ধ্যা হইয়াছে। আকাশে তারা উঠিয়াছে। গিয়াস আপন কক্ষে বসিয়া, আপন মনে ভাবিতেছে। দ্যূতক্রীড়ায় এখন আর প্রমোদ উপস্থিত হয় না, রাস্তায় বাহির হইতেও ইচ্ছা হয় না। নির্জ্জনবাসই এখন তাঁহার একান্ত বাঞ্ছনীয়। চিন্তা—চিন্তা, কেবল চিন্তা। চিন্তার আদি নাই, অন্ত নাই, দিনরাত

চিন্তা, চিন্তাবিষে এই কয়েক দিনে তাঁহার শরীর শীর্ণ, মুখকান্তি বিবর্ণ, এবং মলিন হইয়াছে।

অদ্য সন্ধ্যার পর আপন নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে বসিয়া ভাবিতে-ছেন, "রৌশিনারা এখন কোথা? খাঁ সাহেবের অভিপ্রায় কি? তাহাকে গোপন রাখিয়া আমাকে বিপন্ন করিবার জন্য ত এই চাতুরীজাল বিস্তারিত হয় নাই? কিংবা তাহাকে হত্যা করিয়াছে, আপনার দোষ ঢাকিবার জন্য, আমাকে বিপদগ্রস্ত করিবার জন্য, এই অভিযোগ আনিয়াছে। কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। এ সময়ে যদি তাহাকে পাইতাম, আমার জীবনভার এত দুর্ব্বহ হইত না।"

সহসা বহির্দ্বারে কে করাঘাত করিল। ভৃত্য দ্বার খুলিয়া দিল। মুসলমানবেশে তারাচাঁদ বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। ভৃত্য তাহাকে চিনিত,—আরও পূর্ব্বে কয়েকবার তারাচাঁদ এই বেশে গিয়াসের বাড়ীতে আসিয়াছিল। এখানে তারা-চাঁদের নাম ইলাহি বক্স।

ইলাহি বক্সকে দেখিয়া, গিয়াস উদ্দিন উদ্বিগ্ন হইলেন। নম্রস্বরে কহিলেন, "আমায় ক্ষমা কর, তোমার টাকাটা এখনও সংগ্রহ করিতে পারি নাই। প্রত্যুত আমি নানাপ্রকারে বিপন্ন।"

তারাচাঁদ শৈলপুরে আসিয়া গিয়াস উদ্দিন সম্বন্ধে সকল সংবাদই জ্ঞাত হইয়াছে। এক্ষণে কহিল, "আমি টাকার জন্য তোমার নিকট আসি নাই। বিশেষ প্রয়োজন আছে, আমার সহিত এস। আমি তোমার বিপদের কথা শুনিয়াছি।"

গিয়াস উদ্দিন তারাচাঁদের সহিত বাটী হইতে বহির্গত হইলেন। দুই জনে পরিভ্রমণ করিতে করিতে, মামুদপুরের

সীমা অতিক্রম করিয়া, প্রান্তরে আসিয়া পড়িলেন। গিয়াস জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় যাইতেছ?"

এই মুসলমানবেশী তারাচাঁদের নিকটেই গিয়াসউদ্দিন দ্যূত-ক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া ঋণী হইয়াছেন। তারাচাঁদ কহিল, "আমি টাকার তাগাদা করিতে আসি নাই, তোমার কোন ভয় নাই! তুমি রৌশিনারার সহিত দেখা করিতে চাও?"

গিয়াস। রৌশিনারার সহিত! কোথায় রৌশিনারা?

তারা। তারাসর্দ্দারের আড্ডায়—দস্যুর আবাসে।

গিয়াস। দস্যুর আবাসে! কোথায় সে আড্ডা?

তারা। আড্ডার কথা পরে বলিব, এখন তুমি তাহাকে দেখিতে চাও?

গিয়াস। তুমি কে?

তারা। আমারই নাম তারাসর্দ্দার।

গিয়াস। অসম্ভব!

তারা। প্রকৃতই তাই।

তখন তারাসর্দ্দার রৌশিনারা ঘটিত তাবৎ বিষয় বলিল। গিয়াস উদ্দিন কহিলেন, "তারাচাঁদ! আমি এখন বিপন্ন। তোমার মত লোকের সাহায্যই এখন আমার বাঞ্ছনীয়। চল, আমি রৌশিনারার নিকট যাইব। আমার চারিদিকে প্রবল শত্রু, আমি কোনরূপেই আত্মপক্ষ সমর্থনে সমর্থ হইব না।"

সর্দ্দার সম্মত হইল। গিয়াস উদ্দিনের চক্ষু বাঁধিয়া তাঁহাকে তাহাদের আড্ডাভিমুখে লইয়া চলিল।

শৈলপুরের নিকট গঙ্গার উপকূলে এক বিজন বিপিন। তারাসর্দ্দার গিয়াস উদ্দিনকে লইয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ

করিল। নিবিড় জঙ্গলের মধ্যস্থলে উপস্থিত হইয়া, একটী বৃক্ষমূলসংলগ্ন একগাছি রজ্জু ধরিয়া তিনবার টানিল। সে রজ্জু সচরাচর সাধারণ লোকের চক্ষে পতিত হয় না। রজ্জু ধরিয়া টানিবা মাত্র, ভূগর্ভের মধ্যে ঘণ্টাধ্বনি হইল। পার্শ্বেই এক স্থানে বহুসংখ্যক প্রস্তর সজ্জিত ছিল। হঠাৎ দেখিলে, কৃত্রিম পাহাড় বলিয়া অনুমান হয়। ক্ষুদ্র বৃহৎ বিস্তর প্রস্তর। তাহার চারিদিকে ক্ষুদ্রবৃহৎ অসংখ্য লতাগুল্ম। এই প্রস্তর-রাশির মধ্যে একখানি সহসা সরিয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে একটী বৃহদাকার ছিদ্রপথ বা দ্বার মুক্ত হইল। একজন লোক আলোকহস্তে সম্মুখে দাঁড়াইল। তারাচাঁদ গিয়াস উদ্দিনের হাত ধরিয়া, মুক্তপথে তাহার মধ্যে প্রবেশ করিল। প্রস্তর পূর্ব্বস্থানে পুনঃ স্থাপিত হইল। ভূগর্ভের মধ্যে দিব্য সুন্দর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ। বায়ু চলাচলের জন্ম মধ্যে মধ্যে, বনের ভিতর, বৃক্ষমূলে ছিদ্রপথ। সূর্য্যালোক তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। প্রদীপালোকে সকল কার্য্য চলে। বৃষ্টির পূর্ব্বে ছিদ্রগুলি আবদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

ভূগর্ভে আসিয়া গিয়াস উদ্দিনের চক্ষের বন্ধন খুলিয়া দেওয়া হইল। তারাচাঁদের ইঙ্গিতে, একজন দস্যু তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া, রৌশিনারার প্রকোষ্ঠে লইয়া গেল।

রৌশিনারা গিয়াস উদ্দিনকে পাইয়া পুলকিত হইল। সপ্তাহ পরে তারাচাঁদের পরামর্শানুসারে রৌশিনারা এবং গিয়াস উদ্দিন, যমুনা যে বনে বাস করিতেছিল, সেই স্থানে গিয়া রহিল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

নদীবক্ষে।

যমুনা বন্দিনী অবস্থায় ভগ্নাট্টালিকা মধ্যে ছয় মাস অতিবাহিত করিল। ইহার মধ্যে তারাচাঁদ সাহস করিয়া একদিনও তাহার কক্ষে প্রবেশ করিতে পারে নাই। গোরাচাঁদের উপর দলের ভার দিয়া, তারাসর্দ্দার যমুনাকে লইয়া বনমধ্যেই আছে। মাণিকলাল পূর্ব্ববৎ রন্ধনাদি কার্য্য সম্পন্ন করে। অপর একটী প্রকোষ্ঠে গিয়াস উদ্দিন এবং রৌশিনারা থাকে। গিয়াস এখন দস্যুদলে মিশিয়াছে। লুণ্ঠিত দ্রব্যের দ্বারাই তাহার দিন চলিতেছে। রৌশিনারা গিয়াসের সহবাসে মনের আনন্দে দিন যাপন করিতেছে।

যমুনাকে বশীভূত করিতে তারাচাঁদের চেষ্টার ক্রটী নাই, অনুনয়ে বিনয়ে, ভয় প্রদর্শনে কিছুতেই যমুনার দৃকপাত নাই। যমুনার করে ছুরি দেখিয়া, সাহস করিয়া তারাচাঁদ তাহার নিকটবর্ত্তী হইতে পারে না।

এক দিবস প্রাতঃকালে যমুনা কক্ষদ্বার মুক্ত পাইয়া, গৃহ হইতে বহির্গত হইল। যমুনা জানিত, সে দিন গিয়াসউদ্দিন বা মাণিকলাল, কেহ সেখানে উপস্থিত নাই। কেবল দুইজন

মাত্র তাহার প্রতিকূলতাচরণ করিতে পারে। এই দুইজনের মধ্যে একজন রমণী। ভয় কেবল দস্যুসর্দ্দারকে। কিন্তু ভয় করিতে গেলে, আজীবন তাহাকে এই ভাবে, এই স্থানে কাটাইতে হইবে। যমুনা সাহসে ভর করিয়া, শানিত ছুরিকাহস্তে বেগে গৃহ হইতে বাহির হইল। রৌশিনারা তখন দ্বারে প্রহরী স্বরূপ ছিল। যমুনার রোষানলবিস্ফারিতনেত্র এবং হস্তে ভীষণ ছুরিকা দেখিয়া, ভয়বিহ্বলা রৌশিনারা দ্বার ছাড়িয়া দিল।

তারাচাঁদ কিয়দ্দূরে কার্য্যান্তরে ব্যস্ত ছিল। রৌশিনারার চীৎকারে ছুটিয়া আসিল। তাহার মুখে যমুনার পলায়নের কথা শুনিয়া, তাহার পশ্চাদনুসরণ করিল। যমুনা ইতিমধ্যে নদীতটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। বর্ষাকালে কালিন্দীর কাল জল আবিল হইয়া, কূলে কূলে তরঙ্গাঘাত করিয়া, খরস্রোতে বহিতেছে। সম্মুখে বর্ষার জলরাশিতে পরিপূর্ণকলেবরা, তরঙ্গবিভঙ্গময়ী যমুনা—যমুনা সাঁতার জানে না। পশ্চাতে দস্যু, বামে দক্ষিণে পথপরিশূন্য, বিরলছিদ্র বনানী। যমুনা নদীকূলে পশ্চাৎ ফিরিয়া, ছুরিকাহস্তে দস্যুর দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল। যমুনার সে সময়ের রূপমাধুরী ভয়ঙ্করী, অতুল্য সৌন্দর্য্যময়ী। পাঠক হয় ত, সৌন্দর্য্যের ভীষণতার কথা শুনিয়া হাসিবেন। সকল সৌন্দর্য্যই কি কমনীয়, মনোজ্ঞ? প্রাবৃটের নীলনভোতলে নীরদকান্তি দর্শন করিলে, কাহার মনে না আনন্দের সঞ্চার হয়। কিন্তু সেই শ্যামকান্তি নীরদকোলে যখন দামিনী ঝলসিতে থাকে, তখন কাহার অন্তরে না আতঙ্কের উদ্রেক হয়? যমুনার এখনকার আকৃতি প্রকৃতিও তদ্রূপ।

নয়নদ্বয় রোষবিস্ফারিত হইয়া, ধক্ ধক্ জ্বলিতেছে, দক্ষিণকরে কৃতান্তরসনাসদৃশী ভীষণ ছুরিকা রৌদ্রকরে ঝক্ ঝক্ করিতেছে, অসুরবিনাশে ভবেশভামিনী যেন অসিকরে দাঁড়াইয়াছেন। দস্যুসর্দ্দার শূন্যহস্তে—যমুনার সে ভীষণবেশ দেখিয়া, সাহস করিয়া অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। যমুনার পরাক্রম, যমুনার ছুরিকাপরিচালনের শক্তি তারাচাঁদ স্বচক্ষে দেখিয়াছে, কোন্ সাহসে এখন সে ঐ কৃতান্তরূপিণী রমণীর নিকটবর্ত্তী হইবে! তারাচাঁদ ইতস্ততঃ করিতে লাগিল।

যমুনা যমুনার কূলে দণ্ডায়মানা। সে স্থানের উপকূল-ভূভাগ জল হইতে অনেক উচ্চ। নিম্নের তটভূমি বিধৌত করিয়া, বর্ষার কুলপ্লাবিনী কালিন্দী বহিয়া যাইতেছে। তরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাতে যমুনার পদনিম্নস্থ ভূমি যে ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে, 'ধস্' নামিয়া যমুনাসলিলে পড়িবার উপক্রম করিতেছে—সে দিকে কাহারও লক্ষ্য নাই। নীরবে এই কার্য্য চলিতেছে।

এদিকে তারাসর্দ্দার পার্শ্বস্থ একটা বৃক্ষের ডাল ভাঙ্গিয়া, তদ্‌প্রহারে যমুনাকে অস্ত্রচ্যুত করিবার জন্য অগ্রসর হইল। যমুনা বর্দ্ধিতরোষে, দ্বিগুণোৎসাহে ছুরি তুলিয়া প্রহার করিতে উদ্যত হইল। এই সময়ে তারাসর্দ্দারের পশ্চাতে আসিয়া আর এক ব্যক্তি দাঁড়াইল। তাহার সন্ন্যাসীর বেশ। তাহার উপর দৃষ্টি পড়িবামাত্র যমুনা শিহরিয়া উঠিল—সেই মুহূর্ত্তে তরঙ্গপ্রতিহত তটভূমি ধসিয়া যমুনাগর্ভে পড়িল।

যে স্থলে যমুনা পড়িল, সে স্থানের জল আবর্ত্তে আবর্ত্তে ঘুরিতেছে—তরঙ্গে তরঙ্গে নাচিতেছে। তারাসর্দ্দার কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। যমুনা জলে পড়িয়া, হাবুডুবু

খাইয়া, চীৎকার করিয়া কহিল, "ব্রজেন্দ্র! ব্রজেন্দ্র! আমায় বাঁচাও!"

সন্ন্যাসী ব্রজেন্দ্র। কমণ্ডলু চিমটা দূরে নিক্ষেপ করিয়া, যমুনাবক্ষে লম্ফ দিয়া পড়িলেন এবং সন্তরণকৌশলে যমুনার তরঙ্গাভিঘাত ঠেলিয়া, নিমজ্জমানা যমুনার হস্ত চাপিয়া ধরিলেন। তাহার পর কহিলেন, "আমার কাপড় চাপিয়া ধর, ভয় নাই, শীঘ্রই আমরা অপর পারে উত্তীর্ণ হইব।"

ব্রজেন্দ্র যমুনার ভীষণ তরঙ্গবেগ দুইপার্শ্বে ঠেলিয়া, যমুনাকে লইয়া, ভাসিতে ভাসিতে চলিলেন। তারাচাঁদ অবাক হইয়া, সে দৃশ্য দেখিতে লাগিল। ব্রজেন্দ্রের মত জলে লাফাইয়া পড়িতে তাহার সাহস হইল না।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

মুমূর্ষু-মুখে।

ব্রজেন্দ্র যমুনাকে লইয়া কূলে উঠিলেন। বাক্‌শক্তিহীনা যমুনার মুখে আজি অকস্মাৎ বাক্যস্ফূর্ত্তি হইতে দেখিয়া, ব্রজেন্দ্রের আর আনন্দের সীমা নাই। সিক্তবাসে যমুনা-কূলে দাঁড়াইয়া, ব্রজেন্দ্র ডাকিলেন, "যমুনা!"

যমুনা বীণাঝঙ্কারবৎ মধুর রবে উত্তর করিল, "ব্রজেন্দ্র!"

বিষয়-সম্পত্তি হারাইয়া, যমুনাকে না দেখিয়া, ব্রজেন্দ্র বন-চারী হইয়াছিলেন, সন্ন্যাসীর বেশে বনে বনে, তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছিলেন। আজি যমুনাকে দেখিয়া, তাহার মুখের মধুর বচন শুনিয়া, ব্রজেন্দ্রের বৈরাগ্য ভাসিয়া গেল; যমুনাকে লইয়া সংসারী হইতে বাসনা জন্মিল।

যমুনা পুনরায় কহিল, "ব্রজেন্দ্র! চল, শীঘ্র এ স্থান হইতে প্রস্থান করি। তারাসর্দ্দার নৌকায় অপেক্ষা করিতেছে; নৌকা আসিলে, আমাদিগকে পুনঃ বিপন্ন হইতে হইবে।"

ব্রজেন্দ্র যমুনার কথার সারবত্তা বুঝিয়া, তাহার হাত ধরিয়া লোকালয়ের উদ্দেশে চলিলেন।

বেলা যখন দ্বিপ্রহর, তখন তাঁহারা একটী পল্লীগ্রামে উপস্থিত হইয়া এক গৃহস্থের বাটীতে আশ্রয় লইলেন। সেখানে ব্রজেন্দ্র যমুনার মুখে তাহার জীবনের যাবতীয় ঘটনা অবগত হইলেন। তাহার হৃদয়ের উচ্চতা, পরোপকারে স্বার্থ বিসর্জ্জনের ক্ষমতা দেখিয়া, ব্রজেন্দ্র বিমুগ্ধ হইলেন। যমুনা রমণীরত্ন, যমুনা নারীকুলের গৌরব ভাবিয়া, ব্রজেন্দ্র তাহার প্রতি অধিকতর আসক্ত হইয়া পড়িলেন।

সে গ্রামে দুই দিন অবস্থান করিয়া, যমুনা একটু সুস্থ হইলে, ব্রজেন্দ্র তাহাকে লইয়া শৈলপুরাভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। সে স্থান হইতে শৈলপুর একদিনের পথ। অর্থাভাবে এবং কোন যানের সুবন্দোবস্ত না থাকাতে, তাঁহারা পদব্রজে চলিতে বাধ্য হইলেন।

প্রণয়াসক্ত যুবক-যুবতী মধুময়ী প্রকৃতির সৌন্দর্য্যভাণ্ডার দেখিতে দেখিতে পথ চলিতে লাগিলেন। নির্জ্জন প্রান্তরে পরস্পর হাত ধরাধরি করিয়া, বক্রকটাক্ষে উভয়ে উভয়ের মুখপানে চাহিতে চাহিতে, দুইজনে অনেক পথ অতিক্রম করিলেন। যমুনা আর চলিতে পারে না, ব্রজেন্দ্র এক সরাইয়ে আশ্রয় লইলেন। প্রাতঃকালে উঠিয়া পুনরায় চলিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় দিবস বেলা যখন প্রহরাতীত, তখন তাঁহারা একটী বনমধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বনপথে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইবামাত্র, পথিপার্শ্বে এক ব্যক্তিকে পতিত দেখিয়া উভয়ে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন।

পতিত ব্যক্তি দস্যুসর্দ্দার তারাচাঁদ। দলে ফিরিবার সময়

বনমধ্যে সর্পে দংশন করিয়াছে। তারাসর্দ্দারের মৃত্যুকাল উপস্থিত। তীব্র বিষ শোণিতের সহিত মিশিয়াছে—মুখে কালিমা পড়িয়াছে—তারাচাঁদ বিষের জ্বালায়, মাটীতে পড়িয়া ছট্‌ফট করিতেছে। যমুনাকে ব্রজেন্দ্রের সহিত তথায় সমুপস্থিত দেখিয়া মুমূর্ষু দস্যু কহিল, "ব্রজেন্দ্র! তুমি চমকিত হইও না, আমি তোমায় চিনি এবং তোমার সহিত যমুনার কি সম্বন্ধ তাহাও জানি। মৃত্যুকালে তোমায় একটা কথা বলিয়া যাইব।"

দস্যু থামিল, তাহার শরীর ক্রমশঃ অবশ হইয়া আসিতে লাগিল। যমুনা ব্রজেন্দ্রের হাত ধরিয়া কহিল, "চল, এ স্থান হইতে প্রস্থান করি। আমার বড় ভয় হইতেছে।"

যমুনা ব্রজেন্দ্রের হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। ব্রজেন্দ্র অনিচ্ছাসত্ত্বে গমনোন্মুখ হইলেন। দস্যুর মুখে একটু হাসি আসিল। কহিল, "যমুনা! যে রমণী অনায়াসে নারী হত্যা করিতে পারে, মানুষ মরিতেছে দেখিয়া, তাহার ভয় হয়, বড়ই আশ্চর্য্য কথা!"

ব্রজেন্দ্র পশ্চাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। যমুনা কহিল, "ও কি শুনিতেছ, এস, বিলম্ব করিও না। প্রলাপ বকিতেছে।" তারাচাঁদ কহিল, "শোন ব্রজেন্দ্র! একটা কথা শুনিয়া যাও, যাহাকে সুন্দরী ভাবিয়া হৃদয়ে ধরিতে ব্যাকুল হইয়াছ, সে তোমার ভগিনী অলকার হত্যাকারিণী।"

ব্রজেন্দ্রের সম্মুখে যেন এককালে শত অশনি পতিত হইল। ব্রজেন্দ্র স্তম্ভিত হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। যমুনার মুখের দিকে চাহিলেন, যমুনা বাত্যাবিতাড়িত কদলি-পত্রের ন্যায়

কাঁপিতেছে—মুখের আর সে হাস্য-বিজড়িত প্রভা নাই—নয়নের আর সে প্রফুল্ল ভাব নাই। অশ্রুপ্লাবিত বদনে ক্ষিতি-লগ্ননয়নে নীরবে দণ্ডায়মানা। দস্যুর দিকে চাহিয়া দেখিলেন, তাহার ভৌতিক দেহ পড়িয়া আছে, প্রাণপাখী দেহপিঞ্জর ছাড়িয়া উড়িয়া গিয়াছে।

যমুনা কাঁদিয়া, ব্রজেন্দ্রের পায়ে ধরিয়া কহিল, "ব্রজেন্দ্র! ব্রজেন্দ্র! আমায় ত্যাগ করিও না। আমায় ক্ষমা কর, আমি মিথ্যা বলিব না। সত্য আমি অলকাকে হত্যা করিয়াছি। জানিতাম না, সে তোমার ভগিনী। তোমার প্রতি আমার প্রবল আসক্তিই সকল অনিষ্টের মূল, আলকাকে আমার প্রণয়ের অংশভাগিনী—তোমার প্রণয়-প্রত্যাশিনী উপ-পত্নী ভাবিয়াছিলাম, তাই তাহাকে হত্যা করিয়াছি।"

ব্রজেন্দ্র নীরব। যমুনা পুনঃ পুনঃ তাঁহার চরণে ধরিয়া কাতরে রোদন করিতেছে, তাঁহার গ্রাহ্য নাই। কিয়ৎক্ষণ পরে কহিলেন, "যমুনা! এই দেখা শেষ দেখা! তোমার সহিত আমার মিলন অসম্ভব। যাহার হস্ত অলকার রক্তে কলঙ্কিত হইয়াছে, তাহাকে ব্রজেন্দ্র প্রণয়চক্ষে দেখিতে পারে না। সংসারে আমার সুখ নাই—সংসার, তুমি শ্মশান হও—অলকা অলকা!"

ব্রজেন্দ্র উন্মত্তবৎ ছুটিয়া, সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন ধূল্যবলুণ্ঠিতা যমুনা সেই স্থানে পড়িয়া রহিল।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

অস্ত্রমুখে।

যমুনা অনেকক্ষণ ধরিয়া, সেই স্থানে পড়িয়া কাঁদিল। কাঁদিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া বসিল। পার্শ্বে দস্যুর শব পড়িয়া আছে, গ্রাহ্য নাই। যমুনার হৃদয়ে বড়ই আঘাত লাগিয়াছে। ব্রজে-ন্দ্রের আশা ত্যাগ করিয়া, যমুনা আত্মপ্রাণ বিনাশে মনস্থ করিল। পরক্ষণে শৈলপুর, অজয়, মাতার শেষ আদেশের কথা স্মরণ হইল। যমুনা আপন মনে কহিল, "না, মরিব না— ব্রজেন্দ্র আমার কে? কেন তাহার জন্য মরিব। এখনও আমার অনেক কার্য্য বাকি। জীবনের উদ্দেশ্য এখনও অসম্পন্ন।"

যমুনা বসিয়াছিল, উঠিয়া দাঁড়াইল। বেলা দ্বিতীয় প্রহর অতীত। যমুনা ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া, অতি কষ্টে পথাতিক্রম করিতে লাগিল। যখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ, তখন শৈল-পুরের নিকটবর্ত্তী বনের নিকট উপস্থিত হইল এবং পথভ্রান্ত হইয়া ক্রমশঃ বনমধ্যে অগ্রবর্ত্তিনী হইতে লাগিল। সহসা মনুষ্য-কণ্ঠস্বর তাহার শ্রুতিগোচর হইল। স্বর তাহার পরি-

চিত। নিমচাঁদ এবং গোরাচাঁদ পরস্পর কথা কহিতে কহিতে আডডায় যাইতেছে। যমুনা এক অসম সাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল। রাত্রির অন্ধকারে বৃক্ষচ্ছায়ায় আত্মগোপন করিয়া তাহাদের অনুসরণ করিতে লাগিল। হঠাৎ তাহারা থামিল। যমুনাও এক বৃক্ষান্তরালে লুকাইল। গোরাচাঁদ পূর্ব্বের ন্যায় রজ্জু টানিয়া সঙ্কেত করিল, প্রান্তর অপসারিত হইল। দস্যু দুইজন ভূগর্ভে প্রবেশ করিল। দ্বার রুদ্ধ হইল।

যমুনা বহুকষ্টে বন হইতে বাহির হইয়া, শৈলপুরে প্রবেশ করিল। কিন্তু বরাবর বাটী না গিয়া, ডাক্তার নিরঞ্জন বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিল।

নিরঞ্জন বাবুর সহিত যমুনার গোপনে অনেক কথাবার্ত্তা হইল। যমুনা বাটীর অভিমুখে ফিরিল, নিরঞ্জন বাবু নন্দীগ্রামে চলিলেন।

অজয় বাবু যমুনার ন্যায় স্নেহবতী সহোদরার সন্দর্শন পাইয়া যার-পর-নাই আহ্লাদিত হইলেন। জমিদার-বাটীতে আনন্দ কোলাহল উপস্থিত হইল। যমুনা অজয়ের নিকট এখনও সেই বাক্‌শক্তিবিহীনা বধিরা।

এদিকে নিরঞ্জন বাবু নন্দীগ্রামে উপস্থিত হইয়া ফৌজদারের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। দস্যুদের গুপ্ত আবাসের বিষয় কোনরূপে তিনি সন্ধান পাইয়াছেন, জ্ঞাপন করিলেন। ফৌজদার স্বয়ং একশত জন পদাতি লইয়া বনাভিমুখে অভিযান করিলেন;—নিঃশব্দে ধীরে ধীরে বনমধ্যে উপস্থিত হইলেন। অনায়াসেই নিরঞ্জন বাবুর বর্ণনানুযায়ী প্রস্তর-রাশি দেখিতে পাইলেন। অধিকাংশ সৈন্য বনমধ্যে গোপন রাখিয়া, কতিপয়

মাত্র সহচরের সহিত স্বয়ং ফৌজদার নিকটে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

প্রভাত হইয়া আসিল। উষার ক্ষীণালোক অল্পে অল্পে বনমধ্যে প্রবেশ লাভ করিতে লাগিল। গোরাচাঁদ মাণিক-লালের সহিত গুপ্ত আবাসের দ্বার মুক্ত করিয়া বাহির হইল। অমনি ফৌজদারের তরবারি প্রহারে মাণিকলালের মস্তক স্কন্ধচ্যুত হইয়া ভূতলে পড়িল। অপর এক পদাতিকের শস্ত্রা-ঘাতে গোরাচাঁদেরও জীবলীলা পরিসমাপ্ত হইল। নিমিষের মধ্যে এই কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল। গুপ্তদ্বার তখনও উন্মুক্ত, ফৌজদারের আদেশে বিংশজন সশস্ত্র যোদ্ধা ছুরিকা হস্তে দ্বারপথে ভূগর্ভে লাফাইয়া পড়িল। যে দস্যু দ্বার রুদ্ধ করিতে আসিয়াছিল, সে তৎক্ষণাৎ রক্তাক্তদেহে ভূশায়িত হইল। দস্যুরা এখনও সকলে জাগরিত হয় নাই—যে যেখানে সুবিধা পাইয়াছে, পড়িয়া নিদ্রা যাইতেছে। ফৌজদার সাহেব সঙ্গে কতকগুলি মশাল আনিয়াছিলেন। অবিলম্বে সে গুলি জ্বালিত হইল। অন্ধকার ভূগর্ভ আবাস আলোকিত হইল। অতি অল্পক্ষণের মধ্যে বহুকালের জনাতঙ্কসঞ্চারী দুর্দ্দান্ত দস্যুদল নিহত হইল।

দস্যুগণের বহুকালের সঞ্চিত ধনরত্নাদি লুণ্ঠন করিয়া ফৌজদার সদলে নন্দীগ্রামে ফিরিলেন। পরদিবস তাঁহার আদেশে দস্যুদের গুপ্ত আবাস ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

প্রতিহিংসা।

সন্ধ্যা হইল। অজয়কুমার সরসীর পিসীর বাড়ীর দিকে চলিলেন। সরসী জমিদার-বাটীতে এখন আর বড় একটা আসে না। অজয়কুমার তাহাদের সংসার নির্ব্বাহোপযোগী সমস্ত দ্রব্য বিশ্বস্ত ভৃত্যের দ্বারা পাঠাইয়া দেন। সরসীর সহিত অজয়ের মধ্যাহ্নে সাক্ষাৎ হইয়াছিল। যমুনার ষড়যন্ত্রেই যে সরসীকে লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল, তাহা এখন সরসী এবং অজয় জানিতে পরিয়াছেন। যমুনা প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছে। সে জানিতে পারিলে পাছে তাহাদের প্রস্তাবিত বিবাহে অন্তরায় হয়, ভাবিয়া অজয় সরসীকে গোপনে বিবাহ করিতে মনস্থ করিয়াছেন। বিবাহ হইয়া গেলে, অজয় যমুনাকে বুঝাইয়া বলিবেন। স্নেহপরায়ণা সহোদরা তাঁহাদের অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।

আজি রাত্রে সরসীর পিসীর বাড়ীতে তাঁহাদের বিবাহ। কেবল কুলপুরোহিত এবং কতিপয় মাত্র বিশ্বস্ত আত্মীয় এ বিষয় পরিজ্ঞাত আছেন।

অজয় বাটী হইতে প্রস্থান করিলে, যমুনা মালতীর বাড়ীতে

উপস্থিত হইল এবং তাহাকে কহিল, "মালতী! শীঘ্র আমার সঙ্গে আয়।"

মালতী বিস্মিত হইয়া যমুনার মুখপানে চাহিয়া রহিল। যমুনা তাহার মনোভাব বুঝিয়া কহিল, "দৈবানুগ্রহে আমি বাক্‌শক্তি ও শ্রবণশক্তি ফিরিয়া পাইয়াছি। আয়, শীঘ্র আমার সঙ্গে আয়, যদি তোর ছেলেকে দেখিবার সাধ থাকে, বিলম্ব করিস্ না।"

মালতী ব্যাকুলা হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমার ছেলে কোথা? নিমচাঁদের কি হইয়াছে?"

যমুনা। পাইকের সঙ্গে দাঙ্গায় জখম হইয়াছে, বাঁচে কি না সন্দেহ। আমি তাহাকে লুকাইয়া রাখিয়াছি।

মালতী আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব করিল না। যমুনার কথায় বিশ্বাস করিয়া, তাহার সঙ্গে চলিল। যমুনা তাহাকে সঙ্গে লইয়া উদ্যানবাটিকার মধ্য দিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল এবং গুপ্তদ্বার খুলিয়া, অট্টালিকার মধ্যস্থ পাতালপুরীতে প্রবেশ করিতে লাগিল।

ঘোর অন্ধকার। যমুনা আলোক জ্বালিল। মালতী ভয়ে বিস্ময়ে বিহ্বলা হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এ কোথায় যাইতেছ?"

যমুনা। ভয় কি তোর। পাছে ফৌজদারের পাইকেরা সন্ধান পাইয়া তোর ছেলেকে ফাঁসীতে লটকাইয়া দেয়, এই ভয়ে আমি তাহাকে পাতালপুরীর মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছি।

পুত্রস্নেহকাতরা মাতা তাহাই বিশ্বাস করিল। তখন প্রায় অবস্থাপন্ন সকল ব্যক্তিই (বড় লোকের বাটীর নীচে এইরূপ একটা গুপ্তস্থান থাকিত) দস্যু তস্করের ভয়ে সেখানে ধনরত্ন

লুকাইয়া রাখিত অথবা যুদ্ধবিগ্রহের সময়ে সপরিবারে তাহার মধ্যে গোপনে বাস করিত।

আলোকহস্তে যমুনা ভূগর্ভের মধ্যে সোপানপথে অবতরণ করিতে লাগিল। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া, একটী দ্বার পাইল। যমুনা দ্বার মুক্ত করিল, মালতী তাহার মধ্যে প্রবেশ করিল। যমুনা সে দ্বার সাবধানে রুদ্ধ করিয়া পুনরায় অগ্রসর হইতে হইল। ভূগর্ভের মধ্যে প্রশস্ত গৃহ। মালতীর হৃদয় কাঁপিতে লাগিল। কি একটা আতঙ্কে হৃদয় পূর্ণ হইল। মনে মনে জিজ্ঞাসা করিল, "এও কি সম্ভব! কালা বোবা যমুনা সে সংবাদ কি জানে? অসম্ভব! আমি বৃথা ভয় করিতেছি।"

যমুনা পুনরায় আর একটী দ্বার খুলিল। মালতী তাহার মধ্যে প্রবেশ করিল। যমুনা পূর্ব্ববৎ দ্বার রুদ্ধ করিয়া আলোকটী একস্থানে রাখিয়া দিল। মালতী উৎকণ্ঠিতস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কৈ কৈ আমার নিমচাঁদ?"

যমুনা মালতীর দিকে ফিরিয়া কহিল, "তোমার নিমচাঁদ যমের বাড়ীতে। কাল রাত্রে ফৌজদারের লোকেরা তাহাকে দস্যুদলের সহিত হত্যা করিয়াছে।"

মালতী থর থর কাঁপিতে লাগিল। যমুনার তৎকালীন বিকৃত পৈশাচিক মুখশ্রী দেখিয়া মালতীর প্রাণ উড়িয়া গেল। সে বুঝিতে পারিল, তাহারও অন্তকাল উপস্থিত।

যমুনা বস্ত্রের মধ্য হইতে এক ভীষণ ছুরিকা বাহির করিয়া কর্কশস্বরে কহিল, "মালতী! এখানে তোকে কেন আনিয়াছি বুঝিতে পারিয়াছিস্। সর্ব্বনাসী, পিশাচী, আজ তোর পাপের প্রায়শ্চিত্তের দিন।"

মালতী কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িল। বসিয়া বসিয়া, যমুনার চরণ ধরিয়া কহিল, "তুমি জান—তুমি কি সবই জান? আমায় ক্ষমা কর। আমায় খুন কর না।"

যমুনা। তোকে ক্ষমা করিব? তোকে খুন করিব না? এইখানে—তোর পায়ের নীচে—মাটীর তলায় যাদের দেহাবশেষ পোঁতা আছে—তাদের প্রতি তুই কি দয়া করিয়াছিলি? সেই ধর্ম্মাত্মা সাধুপ্রকৃতি যুবক এবং সেই সাক্ষাৎ লক্ষ্মীরূপিণী সরলা রমণীর প্রতি কি তোর কিছুমাত্র দয়া হইয়াছিল? তোরই পাপ পরামর্শে, তোরই পাপচক্রান্তে সেই কার্য্য সাধিত হইয়াছে। আজ তোর সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে।

যমুনা পদলুণ্ঠিতা মালতীর গলা টিপিয়া তাহার বক্ষের উপর বসিল। মালতী রুদ্ধশ্বাসে ক্ষীণকণ্ঠে কহিল, "যমুনা! আমায় ছাড়! আমার পাপের যথেষ্ট সাজা হইয়াছে—আর—"

মালতীর মুখের কথা মুখে থাকিল, যমুনার ছুরিকা সবেগে নামিয়া, তাহার বক্ষে আমূল বিদ্ধ হইল। পাপসহচরী মালতীর পাপজীবনের অবসান হইল।

যমুনা উঠিয়া দাঁড়াইল। মালতীর দিকে চাহিয়া চাহিয়া কহিলেন, "থাক্ মালতী! এইখানে এই অবস্থায় পড়িয়া থাক্, তোর রক্তে আজ আমার হৃদয়ের হিংসানল নিভিল।"

যমুনা ভূগর্ভমধ্যে অনেকক্ষণ রহিল। সহসা তাহার মনে কেমন একটা ভয়ের সঞ্চার হইল। মাটীর নীচে দুইটী যুবক যুবতীর বিকৃত দেহাবশেষ প্রোথিত—সম্মুখে স্বহস্তে নিহত মালতী পতিত। যমুনার মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটিল। চক্ষের সম্মুখে প্রেতলোকবাসী প্রেতাত্মা আসিয়া যেন নৃত্য করিতে

লাগিল। যমুনা ঊর্দ্ধশ্বাসে সে কক্ষ ত্যাগ করিয়া পলাইল। অন্ধকার পাতালপুরী হইতে বাহির হইয়া গেল। গুপ্তদ্বার রুদ্ধ করিয়া, আপনার কক্ষে আসিয়া শয়ন করিল।

যে সময়ে যমুনা মালতীর বক্ষে ছুরিকা বসাইল, ঠিক সেই সময়ে অজয়ের সহিত সরসীর বিবাহ হইল।

রাত্রির অবসান হইল। প্রভাতে অজয় নবপরিণীতা পত্নীর সহিত আপন আবাসে আসিলেন। পুরবাসিনীরা সংবাদ পাইয়া আনন্দে শঙ্খ ও হুলুধ্বনি করিতে লাগিল।

যমুনার নিকট সংবাদ পৌঁছিল। যমুনার ভয়ানক জ্বর। বিছানায় পড়িয়া ছটফট্ কবিতেছে।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ

গুপ্তগৃহে।

অজয় নবপরিণীতা পত্নীর সহিত পিতার অন্তিম আদেশ পালনার্থ গুপ্তগৃহের অভিমুখে চলিলেন। সংক্ষেপে সরসীকে সকল বিষয় জ্ঞাপন পূর্ব্বক গুপ্তগৃহের দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন।

যমুনা ধীরে ধীরে পাদোত্থান করিয়া সেই কক্ষের সমীপবর্ত্তিনী হইল এবং ঈষন্মুক্ত দ্বারপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইল।

ভয় বিস্ময় এবং কৌতূহলে আবিষ্ট হইয়া অজয় আল্‌মারির চাবি খুলিলেন। দ্বার মুক্ত হইল। সরসী ভয়ে চীৎকার করিয়া অজয়কে বেষ্টন করিয়া ধরিল। অজয় স্তম্ভিত, বাক্‌শক্তি-রহিত। একি ভয়ঙ্কর দৃশ্য! একি পৈশাচিক কাণ্ড!

আল্‌মারির মধ্যে পাশাপাশি শব বিলম্বিত। মাংসহীন, কেবল অস্থিপঞ্জরবিশিষ্ট দুইটী নরদেহ ঝুলিতেছে। সে বীভৎস দৃশ্যে অতি সাহসীরও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।

বাহিরে একজনের পতন শব্দ হইল। অজয় দ্বারের নিকট আসিয়া দেখিলেন—যমুনা মূর্চ্ছিতা। পতিপত্নী ধরাধরি করিয়া যমুনাকে গৃহের মধ্যে লইয়া গেলেন। অল্পায়াসেই যমুনার

চেতন সঞ্চার হইল। যমুনা চীৎকার করিয়া কহিল, "অজয় অজয়! আমি বাঁচিব না!"

ব্যাকুল হইয়া অজয় কহিলেন, "সে কি দিদি! কেন তুমি বাঁচিবে না? তোমার কি হইয়াছে? তোমার গা গরম জ্বর হইয়াছে, জ্বর হইলে কে না বাঁচে? আমি ডাক্তার বাবুকে ডাকিতে পাঠাই।"

যমুনা। না না, ডাক্তার ডাকিতে হইবে না। তুমি পিতার আদেশ পালন কর। আমার জন্য ভাবিও না।

অজয়। দিদি! তুমি কথা কহিতে পার? তোমার বাক্‌শক্তি পুনঃ সঞ্চারিত হইয়াছে, তুমি মরিবে—না—না। আমি ডাক্তারকে সংবাদ দিই।

যমুনা। না অজয়! তোমার এখনও অনেক কাজ বাকি। আলমারির মধ্যে কতকগুলি কাগজ আছে পাঠ কর, আমাদের দুঃখিনী মাতার বিষয় জানিতে পারিবে।

অগত্যা অজয় স্বীকৃত হইলেন। কাগজগুলি বাহির করিয়া পড়িবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। যমুনা সরসীকে ডাকিয়া কহিল, "সরসী! তোর প্রতি অনেক অত্যাচার করিয়াছি, আমায় ক্ষমা কর। তুই এখন আমার বড় আদরের জিনিষ—আমার প্রাণের ভাই অজয়ের বউ! দুঃখ এই, তোকে লইয়া ঘরকান্না করিতে পারিলাম না।"

সরসী যমুনার পার্শ্বে বসিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিল। যমুনার অবস্থা দেখিয়া তাহার সরল হৃদয় বিগলিত হইয়াছে।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

লিপিমধ্যে।

"অজয়কুমার! তোমার এবং তোমার পত্নীর গোচরার্থ আমি নিম্নলিখিত বিষয়টী লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গেলাম। যাঁহাকে তুমি পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছ—যিনি চৌধুরীবংশের বধূ হইয়াছেন, তিনি ইহা হইতে অনেক বিষয় শিক্ষা করিতে পারিবেন।

"আমার ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে আমার পিতার পরলোকপ্রাপ্তি হয়। যখন আমার বয়স অষ্টাদশ বৎসর, আমি একজনমাত্র পরিচারক সঙ্গে লইয়া, দেশভ্রমণে বহির্গত হই। আগ্রায় অবস্থানকালে একদিবস ঘটনাক্রমে এক কিশোরীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। তেমন সুন্দরী পূর্ব্বে আমি কখন দেখি নাই। অনুসন্ধানে জানিলাম, এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ বিধবার কন্যা—নাম সরলা।

"শৈশবেই সরলা পিতৃহীনা হইয়াছে। যা কিছু সামান্য ভূসম্পত্তি ছিল, তাহারই উপসত্ত্ব হইতে তাহাদের সংসার চলিত। সরলার এক সহোদর আছে, সে এক মুসলমান যুবতীর প্রেমাসক্ত হইয়া, তাহাকে লইয়া দিল্লীতে অবস্থান করিতেছে। এই কারণপ্রযুক্ত আগ্রার হিন্দু সম্প্রদায়ের সহিত

তাহাদের সামাজিক আদান প্রদান বন্ধ হইয়াছে। সরলার বিবাহের বয়স উত্তীর্ণ হইয়াছে, কিন্তু তাহার বিবাহ হয় নাই। কোন ব্রাহ্মণসন্তানই সমাজচ্যুত হইবার আশঙ্কায় তাহার পাণি-গ্রহণ করিতে সাহস করিতেছে না।

"আমি সরলার সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। গোপনে তাহার পাণিগ্রহণ করিয়া, তাহাকে স্বদেশে আনিলাম. সরলার মাতা কাশীবাসিনী হইল। বিবাহের পূর্ব্বে সরলা আমার নিকট শপথ করিল, সে কখনও জীবিতকালে কোন লোকের সম্মুখে তাহার বংশের কলঙ্ককাহিনী প্রকাশ করিবে না, কিংবা বিবাহের পর তাহার মাতা বা ভ্রাতার সহিত কোন সংশ্রব রাখিবে না।

"সরলা আমাকে সামান্য ব্রাহ্মণ বলিয়াই জানিত, আমিও সেইরূপ পরিচয় দিয়াছিলাম। কিন্তু শৈলপুরে আসিয়া যখন আমার অতুল বিষয়-সম্পত্তি অবলোকন করিল, তখন আর তাহার আনন্দের সীমা থাকিল না। কয়েক বৎসর অতি আনন্দেই আমার জীবন কাটিয়া গেল।

"বিবাহের আট বৎসর পরে যমুনার জন্ম হইল। আমাদের পতিপত্নীর আর আনন্দের সীমা রহিল না। যমুনা দিনে দিনে শশিকলার ন্যায় পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

"এই ঘটনার প্রায় দেড় বৎসর পরে এক ঘটনা ঘটিল। আমি সপরিবারে হরিবল্লভপুরে এক নিকট আত্মীয়ের বাড়ীতে নিমন্ত্রিত হইলাম। তথায় অবস্থানকালে, একদিবস সন্ধ্যার সময় কোন কার্য্যবশতঃ অন্দরের পুষ্করিণীর ঘাটে উপস্থিত হইলাম। তখনও চন্দ্র উঠে নাই—সন্ধ্যার অন্ধকারে দেখিলাম

কিয়দ্দূরে একটী বৃক্ষের নিম্নে দুইজন স্ত্রীপুরুষে কি কথাবার্ত্তা কহিতেছে। স্ত্রীলোকটীকে দেখিতে ঠিক আমার পত্নী সরলার মত। ঠিক কেন, সে প্রকৃতই সরলা। আমার মনে ঘোর সন্দেহ জন্মিল। পুরুষ কে? সরলার উপপতি! আমি চোখে আঁধার দেখিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে পুরুষ চলিয়া গেল। সরলা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। আমি বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলাম, দেখিলাম, সরলা কিছু চঞ্চলা, কিছু বিষণ্ণা! আমি কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলাম না—করিতেও পারিলাম না। যাহাকে সরলার প্রতিমূর্ত্তি, পবিত্রতার খনি এবং সতীত্বের প্রতিমা বলিয়া জানিতাম, তাহাকে সন্দেহবশে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে আমার সাহস হইল না। আমার যেন মনে হইতে লাগিল, আমারই চোখের ভ্রম—পুষ্করিণীর ঘাটে বৃক্ষমূলে যাহাকে দেখিয়াছি, সে সরলা নহে।

"যাহা হউক, আমি সতর্ক হইয়া রহিলাম। সরলাকে হাতে হাতে ধরিবার চেষ্টায় ঘুরিতে লাগিলাম। আমার চেষ্টা ব্যর্থ হইল। শৈলপুরে আসিলাম, শুনিলাম, সরলা গর্ভবতী। যথাসময়ে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল। আত্মীয়স্বজন সকলেই আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। আমার অন্তরে কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন বিষাদ—ঘোর সন্দেহ। এ সন্তান কি আমার ঔরসজাত।

"অজয়! এখন বুঝিতে পারিতেছ, কেন তোমার প্রতি আমার বিদ্বেষ ভাব? কেন তোমায় আমি ঘৃণার চক্ষে দেখি? তুমি তোমার কলঙ্কিনী মাতার কলঙ্কের জলন্ত নিদর্শন—আমার নির্ম্মল কুলের কলঙ্ক কালিমা। যত তোমার বয়স বাড়ীতে লাগিল, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যত পূর্ণতা হইতে লাগিল, ততই আমার

সন্দেহ এবং বিষাদবহ্নি প্রধূমিত হইতে লাগিল। আমার অঙ্গ-সৌষ্ঠবের সহিত তোমার কোন সাদৃশ্য নাই—তুমি জারজ।

"সরলা আমার বিষণ্ণতার কারণ জিজ্ঞাসা করিত, আমি অন্য কথা তুলিয়া সে কথা চাপা দিতাম। এইরূপে আরও পাঁচ বৎসর কাটিল, ইহার মধ্যে সরলার চরিত্রে আর কোন দোষ দেখিতে না পাইলেও, আমি বীতসন্দেহ হইতে পারিলাম না। হরিবল্লভপুর হইতে শৈলপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াই আমি মালতীকে পরিচারিকা নিযুক্ত করিল। মালতীর কার্য্য সরলার গতিবিধি লক্ষ্য করা। সে গোপনে সংবাদ রাখিত, আমাকে সকল বিষয় জ্ঞাত করিত। পাঁচ বৎসরের পর একদিবস মালতী আমায় সংবাদ দিল, সরলার নিকট কোথা হইতে একখানি পত্র আসিয়াছে, সরলা উহা পাঠ করিয়া অগ্নি সংযোগে পোড়াইয়া ফেলিয়াছে। আমি মালতীকে সাবধানে তাহার সকল কার্য্য লক্ষ্য করিতে আদেশ দিলাম। পরদিবস সন্ধ্যার সময় সরলা দুইতোড়া মোহর লইয়া খিড়কির দরজার নিকট এক যুবকের সহিত সাক্ষাৎ করিল এবং তাহাকে মোহরপূর্ণ তোড়া দুইটী দিয়া আপনার কক্ষে ফিরিয়া আসিল। মালতী আমাকে সংবাদ দিল। ক্রোধে আমার সর্ব্বাবয়ব কম্পিত হইতে লাগিল। প্রতিহিংসাবৃত্তি হৃদয়ে জাগরিত হইয়া উঠিল। আমি সরলার উপপতির সর্ব্বনাশ করিতে কৃতসংকল্প হইয়া, লোক ঠিক করিয়া রাখিলাম; হতভাগ্য যখন শৈলপুরে আসিয়াছে, তখন সরলার সহিত এই একবার সাক্ষাৎ করিয়া ক্ষান্ত থাকিবে না, পুনরায় নিশ্চয় আসিবে। আমি তাহার প্রতীক্ষায় রহিলাম।

"দিনের পর দিন কাটিল। মাসের পর মাস কাটিল। বৎসরও অতিবাহিত হইয়া গেল, কিন্তু সরলার প্রণয়পাত্র ফিরিয়া আসিল না। দেখিতে দেখিতে দুই তিন চারি বৎসর গত হইল। আমি ক্রমশঃ অধৈর্য্য হইয়া পড়িলাম। আরও দুই বৎসর কাটিল, একদিন সন্ধ্যার সময়ে সহসা মালতী আসিয়া সংবাদ দিল, সেই যুবক বাগানের মধ্য দিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছে। উৎকট আনন্দে আমার হৃদয় পূর্ণ হইল। এতদিন পরে আমার হৃদয়ের জ্বলন্ত প্রতিহিংসানল শান্ত হইবে। আমি তৎক্ষণাৎ মালতীর দ্বারা গুণ্ডাদের নিকট সংবাদ পাঠাইলাম।

"আমি এবং দুইজন গুণ্ডা বাগানের মধ্যে বৃক্ষের অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ পরে সরলার সহিত সেই যুবক গুপ্তপথে অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইল। পাপিষ্ঠা যুবককে বিদায় দিয়া অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিল। যুবক যেমন অগ্রসর হইল, অমনি একখানি তীক্ষ্ণধার ছুরিকা তাহার বক্ষঃস্থলে আমূল বিদ্ধ হইল। যুবক আমার পদতলে পড়িল, মুখে একটীও বাঙ্‌নিষ্পত্তি হইল না। গুণ্ডারা তাহাকে তুলিয়া পাতালপুরীতে রাখিয়া, সরলার কক্ষে উপস্থিত হইল এবং তাহার হস্তপদ ও মুখবন্ধন পূর্ব্বক, তাহার মৃত উপপতির নিকট লইয়া আসিল।

"যুবকের সেইরূপ অবস্থা দেখিয়া সরলা মুখ ফিরাইতে চেষ্টা করিল কিন্তু আমার আদেশে একজন তাহাকে শবদেহের দিকে সম্মুখ করিয়া ধরিয়া থাকিল, অপর তীক্ষ্ণধার ছুরিকা সাহায্যে তাহার চক্ষু দুইটী তুলিয়া ফেলিল, নাসিকা ছেদন করিল।

সুন্দর মুখ বিকৃত করিয়া দিল। ঘাতকের নির্দ্দয় নিশিত ছুরিকা তাহার স্পন্দিত হৃৎপিণ্ডকে নিঃশব্দে খণ্ড খণ্ড করিল। যখন তাহার বক্ষঃস্থলে ছুরি আমূল বিদ্ধ হইল, উৎসের ন্যায় শোণিতধারা বেগে ছুটিতে লাগিল, তখন উৎকট আনন্দে আমার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল। ক্রমে ক্রমে তাহার সর্ব্বশরীরের মাংস কর্ত্তিত হইল।

"সরলা সে দৃশ্য দেখিতে পারিল না। মূর্চ্ছা গেল। গুণ্ডারা তাহাকে তাহার শয়নকক্ষে রাখিয়া আসিল। মালতী সেবায় নিযুক্ত হইল।

"মাংসগুলি মাটীর মধ্যে পুঁতিয়া কেবল অস্থিময় দেহটাকে আলমারির মধ্যে টাঙ্গাইয়া রাখিলাম। আমার প্রতিহিংসার অর্দ্ধেক পরিসমাপ্তি হইল।

"আমার মনের অবস্থা ভাল নয়। আমি নির্জ্জন গৃহে বাস করিতে লাগিলাম। কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিতাম না। কেবল মালতী আসিয়া এক একবার সংবাদ দিয়া যাইত। সরলা পীড়িতা। রোগে পড়িয়া আমার সহিত সাক্ষাৎকার প্রার্থনা করিল। আমি আর সে পাপিষ্ঠার মুখাবলোকন করিলাম না। মালতীকে দিয়া বলিয়া পাঠাইলাম, যদি ঘুণাক্ষরে কাহারও নিকট হত্যাব্যাপারের কোন কথা প্রকাশ করে, তবে যমুনা এবং অজয়ের জীবসংশয় ঘটিবে।

"সরলা আমার সাক্ষাৎ পাইল না। উপপতির শোকেই তাহার জীবনান্ত ঘটিল। রাত্রিকালে তাহার দেহ গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিলাম। আমার নিয়োজিত লোকেরা কিন্তু তাহার দেহ তুলিয়া পাতালপুরীতে আনিল, পূর্ব্ববৎ মাংস খণ্ড খণ্ড

করিয়া কাটিয়া ফেলিল, আমি অস্থিময় দেহটা আনিয়া তাহার উপপতির পার্শ্বে লটকাইয়া রাখিলাম। গুণ্ডারা মাংস পুঁতিয়া প্রস্থান করিল।

"এখনও আমার সেই ভাব। কাহারও সহিত সাক্ষাৎ নাই, বিষয়কর্ম্মে মনোনিবেশ নাই, একা নির্জ্জনকক্ষে দ্বার রুদ্ধ করিয়া বসিয়া থাকি। মালতী আসিয়া সংবাদ দিল, যমুনার ভয়ঙ্কর জ্বর, বাতশ্লেষ্মা বিকার। আমি আর সুস্থির থাকিতে পারিলাম না। কক্ষের বাহির হইলাম। নিরঞ্জনবাবু স্থায়ী-ভাবে যত দিন না যমুনা আরোগ্য হয়, আমার বাটীতে রহিলেন। বহু যত্নে যমুনা আরোগ্যলাভ করিল, কিন্তু তাহার বাকশক্তি এবং শ্রবণশক্তি নষ্ট হইয়া গেল।

"যমুনার উক্ত দুইটী ইন্দ্রিয় নষ্ট না হইলে, অজয় তোমাকে আমার বিভবের উত্তরাধিকারী করিয়া যাইতাম না। উইলে আমার মন্তব্য জ্ঞাত হইয়াছ, সে বিষয়ের এখানে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

"তোমার পত্নীর সহিত একত্রে আমার এই লিপি পাঠ করিবে। স্ত্রীচরিত্রে কলঙ্ক স্পর্শ করিলে, তাহার কিরূপ পরিণাম, তিনি যেন ইহা হইতে শিক্ষা করেন। আর তুমিও জানিবে, স্ত্রীর উপর কিরূপ সতর্কদৃষ্টি রাখিতে হয়। আমার বংশে যেন কেহ আর কখন কোন অজ্ঞাতকুলশীল দরিদ্রের কন্যার পাণীগ্রহণ না করে।

"তুমি আমার ঔরসপুত্র নহ—পাপিষ্ঠা সরলার পাপকর্ম্ম ফল। যমুনা মূক বধির না হইলে, তোমাকে বিষয় হইতে বঞ্চিত করিয়া, একটা বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়া যাইতাম।"

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

দেবী না মানবী !

পত্রপাঠ করিয়া অজয়ের মনে যে, তৎকালে কি ভাবের সঞ্চার হইল, তাহা বর্ণনা করা মানবলেখনীর সাধ্যাতীত। অজয় নিশ্চেষ্ট জড়বৎ বসিয়া রহিলেন। তাঁহার গণ্ড বহিয়া অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল।

যমুনা অজয়কে ডাকিয়া কহিল, "অজয়! কাঁদিও না। আমার যাহা বলিবার আছে, শোন—সময় থাকিতে শুনিয়া নাও। আমার আর বেশী বিলম্ব নাই—উঃ—"

যমুনা যন্ত্রণায় দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। সরসী এবং অজয় সমস্বরে কহিল, "দিদি! তোমার বড় কষ্ট হইতেছে। ডাক্তার ডাকিতে পাঠাই।"

বাধা দিয়া যমুনা কহিল, "না, আবশ্যক নাই। ডাক্তারে আমার আর কিছু করিতে পারিবে না। আমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছি, আমার আর বিলম্ব নাই। আমি মরিলে, আমাদের সতী সাধ্বী মাতার নির্দ্দোষিতার কথা শুনিতে পাইবে না।"

আনন্দে অজয়ের ম্লানমুখ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তপ্ত অশ্রুপ্রবাহ গণ্ড বহিয়া ঝরিল। সানন্দে চীৎকার করিয়া

জিজ্ঞাসিলেন, "দিদি! বল বল—যা পড়িলাম, সব মিথ্যা—মা আমাদের সতী সাধ্বী!"

যমুনা। অজয়! জননী আমাদের সাক্ষাৎ লক্ষীস্বরূপিণী। তুমি অবগত হইয়াছ, পিতা এক দরিদ্র বিধবার কন্যাকে বিবাহ করিয়া আনিয়াছিলেন। আমাদের মাতার আর এক ভাই ছিল, তাহার নাম দেবনারায়ণ চক্রবর্ত্তী। তিনি এক মুসলমানীর সহিত আগ্রায় বাস করিতেছিলেন, শুনিয়াছ। কয়েক বৎসর পরে সে যবনীর মৃত্যু হইল। মাতুল বড় অর্থকষ্টে পড়িলেন। চাকুরির আশায় নানাস্থান পর্য্যটন করিতে করিতে হরিবল্লভপুরে উপস্থিত হইলেন। দৈবক্রমে মাতার সহিত মাতুলের সাক্ষাৎ হইল। মার নিকট যাহা কিছু অর্থ ছিল, মাতুলের হস্তে অর্পণ করিলেন। বিবাহের পূর্ব্বে পিতৃবংশের সহিত কোন সম্বন্ধ রাখিবেন না স্বীকার করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু সহোদরের দর্শন পাইয়া তাহা বিস্মৃত হইলেন।

যমুনা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া নীরব হইল। পরে পুনরায় কহিতে লাগিল, "মামা অর্থকষ্টে পড়িয়া শৈলপুরে আসিলেন। পত্রের দ্বারা তাহার আগমন মাকে জানাইলেন। মা তাঁহাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়া বিদায় দিলেন। পাপিষ্ঠা মালতী পিতার নিকট এ বিষয় অতি রঞ্জিত করিয়া বর্ণন করিল। পিতার সন্দেহ ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। তাহার পর ছয় বৎসর পরে মামা পুনরায় সাক্ষাৎ করিলেন। সেই শেষ সাক্ষাৎ। তাহার পর যাহা ঘটিয়াছে, সব শুনিয়াছ। মা আমাদের সাক্ষাৎ সতী লক্ষ্মী!"

যমুনা কাঁদিতে লাগিল। সরসী সযত্নে স্নেহময়ী সহোদরার ন্যায় তাহার চোখের জল মুছাইতে লাগিল। যমুনা ক্রমশঃ অবসন্ন হইয়া পড়িতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে কহিল, "মাতা মৃতুশয্যায় শুইয়া পিতার সাক্ষাৎকার প্রার্থনা করিলেন, পিতা দেখা করিলেন না। দেখা পাইলে, তাঁহার চরণে ধরিয়া সত্য কথা বলিয়া যাইতেন, কিন্তু তাঁহার সে আশা পূর্ণ হইল না। পিতার চোক্ষে কলঙ্কিনী থাকিয়া ভগ্নহৃদয়ে মাতা ইহলোক হইতে চলিয়া গেলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে আমাকে সকল কথা বলিয়া মাতা কহিলেন, যমুনা আমার চরণ স্পর্শ করিয়া শপথ কর, আমি যাহা আদেশ করিব, তাহা পালন করিবে, তোমায় এখন যাহা বলিলাম, কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না। অজয় থাকিল, তাহাকে দেখিও। অজয় তোমার ভাই। তাহাকে তোমার হস্তে অর্পণ করিয়া গেলাম। তাহাকে পেটের সন্তানের মত স্নেহ করিবে। তোমার পিতা তাহাকে ঘৃণা করে। এতদিন সে ঘৃণার কারণ বুঝিতে পারি নাই—এখন পারিয়াছি। মাতা পুত্রকে যেমন স্নেহ করে, বিপদ হইতে রক্ষা করে, তুমি তাহাকে সেইভাবে রক্ষা করিবে। তাহাকে বিপদ হইতে—তোমার পিতার অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবে। তোমা ভিন্ন তাহার আর কেহ নাই। তোমার পিতা হয়ত তাহাকে ত্যাজ্যপুত্র করিয়া যাইবে, অজয় আমার পথের ভিখারী হইয়া রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিবে, তুমি আমার নিকট শপথ কর, অজয়কে রক্ষা করিবার জন্য তোমার জীবনের সকল সুখ—সকল আকাঙ্ক্ষা উৎসর্গ করিবে। বিপদে দৃকপাত করিবে না। আর একটা কথা

স্মরণ রাখিবে, অজয় যাহাতে কখনও কোন দরিদ্রের কন্যার, কিংবা যাহাদের বংশে কোন কলঙ্ক আছে, তাহাদের কাহারও পাণিগ্রহণ না করে। আমি যদি দরিদ্রের কন্যা না হইতাম—আমার বংশে যদি কোন কলঙ্ক কালিমা না থাকিত—আমি যদি কোন সমযোগ্য, অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়ে হইতাম, তাহা হইলে, আজ আমায় এরূপভাবে স্বামীর চক্ষে কলঙ্কিনী হইয়া জীবন ত্যাগ করিতে হইত না। আমি মার চরণ স্পর্শ করিয়া শপথ করিলাম। মাতা ইহধাম ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।"

যমুনা আবার নীরব হইল। তিনজনের চক্ষে অশ্রুধারা। তিনজনেই কাঁদিতেছে। পুনরায় যমুনা বলিতে লাগিল, "এখন সরসী বুঝিতে পারিয়াছ, কেন আমি তোমার প্রতি অত্যাচার করিয়াছিলাম—এখন বুঝিয়াছ, কেন আমি তোমাকে তাহার নয়নপথ হইতে অন্তর্হিত করিয়াছিলাম। আমি শুনিয়াছি, তোমার ভাই বিদেশে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়াছে, তুমি দরিদ্রের কন্যা। তোমার সহিত অজয়ের বিবাহ হইলে, মাতার আদেশ লঙ্ঘিতে হয়; সেই কারণে আমি বিবাহে ব্যাঘাত জন্মাইয়াছিলাম। এখন আর তোমার উপর আমার দ্বেষ বা রাগ নাই। এখন তুমি আমার ভাইয়ের বউ—আমার আদরের জিনিষ।"

পুনরায় যমুনা নীরবে কিয়ৎক্ষণ শুইয়া রহিল। তাহার নয়নে অশ্রুপ্রবাহের বিরাম নাই। সরসী পার্শ্বে বসিয়া তাহার চোক্ষের জল মুছাইতেছে। অজয় নীরবে বসিয়া আছে।

যমুনা কহিল, "মাতার মৃত্যুর পর আমি পীড়িত হইলাম। আমার জীবনের কোন আশা ছিল না। নিরঞ্জনবাবু আমার চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। তিনি আমায় কন্যার ন্যায়

স্নেহ করেন। রুগ্নশয্যায় পড়িয়া আমি ভাবিতে লাগিলাম, কিরূপে আমি অজয়কে রক্ষা করিব, কিরূপে তাহাকে পিতার অত্যাচার হইতে রক্ষা করিব। অনেক ভাবিয়া একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম, কিন্তু সে সিদ্ধান্ত বড় ভয়ঙ্কর। যদি আমি কালা বোবা সাজিতে পারি, কখন কোথায় কি পরামর্শ হইতেছে, কোথায় কি ষড়যন্ত্র চলিতেছে, অনায়াসে জানিতে পারিব। আমায় কালা বোবা ভাবিয়া কেহ গ্রাহ্য করিবে না। আমার দ্বারা যে কোন অনিষ্ট হইতে পারে, কাহারও ধারণায় আসিবে না। কিন্তু অজয়! বাকশক্তি থাকিতে মূকের অভিনয় কি ভয়ঙ্কর, কি যন্ত্রণাময়—তাহা তুমি সহজে বুঝিতে পারিবে না। তোমার উপর তোমার পিতা রুষ্ট—আমি তোমার ভগ্নী—তখন ত্রয়োদশ বৎসরের বালিকামাত্র, জটিলবুদ্ধি পরাক্রান্ত একজন জমিদারের চক্রান্ত হইতে তোমার জীবন রক্ষা যে কি দুরূহ কার্য্য, তাহা আমি কল্পনায় অনেকটা আনিলাম—তোমার মঙ্গলের জন্য—তোমাকে রক্ষা করিবার জন্য, আমি আমার জীবনের সুখস্বচ্ছন্দতা বলি দিলাম। আজীবন কুমারী থাকিয়া, তোমার সুখশান্তি বিধান করিব সঙ্কল্প করিলাম। ডাক্তার বাবুকে আমার অভিপ্রায় জ্ঞাত করিলাম। তাঁহাকে বলিলাম, কোন পারিবারিক দুর্ঘটনা নিবারণের জন্য আমাকে মূক বধির হইতে—জীবন্মৃত হইতে হইবে। ডাক্তার বাবু আমার সহায় হইলেন। তদবধি আমি মূক বধির হইয়া আছি। পিতাকে মৃত্যুশয্যায় শায়িত দেখিয়া আমার মনে আনন্দ হইয়াছিল—মনে করিয়াছিলাম, এইবার আমার দুরবস্থা দূর হইবে। কিন্তু বিধি বাম হইলেন।

শ্মশানঘাটে তোমার প্রতি পিতার আদেশ শুনিয়া, আমার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। আমি বাটী আসিয়া এই কক্ষের চাবি খুলিয়া তাঁহার পত্র পড়িলাম। পড়িয়া আমি বিষন্ন হইলাম। যথাসময়ে উইল পড়া হইল—আমি তোমার মঙ্গলের জন্য জীবনের সকল সুখে জলাঞ্জলি দিলাম। সেই ভাবে কালা বোবা থাকিয়া জীবন কাটাইতাম, কিন্তু বিধির ইচ্ছা অন্যরূপ। আমি সংসার হইতে চলিলাম। অজয়! মরিবার পূর্ব্বে যে পাপিষ্ঠা আমাদের মাতার কার্য্যকলাপে বৃথা দোষ দিয়া পিতার গোচর করিয়াছিল, সেই হতভাগিনীর রক্তে আমার হৃদয়ের প্রতিহিংসানল নিভাইয়াছি। পাতালপুরীর কক্ষে তাহার পাপদেহ পড়িয়া আছে।"

সরসী অজয় শিহরিয়া উঠিল। যমুনা অবসন্নদেহে সরসীর কোলে মাথা রাখিয়া জড়বৎ পড়িয়া রহিল। কিয়ৎক্ষণ পরে যমুনার চক্ষু মুদিয়া আসিল—যমুনা ইহধাম হইতে চলিয়া গেল। অন্তিম সময়ে অস্ফুটস্বরে মুখ হইতে বাহির হইল, "ব্রজেন্দ্র"।

যমুনা মরিল। ভ্রাতৃস্নেহে দেবী—প্রতিহিংসায় পিশাচী, কর্ত্তব্যপালনে পাষাণী। যমুনা ইহধাম হইতে অকালে চলিয়া গেল। যমুনা প্রণয়ে সন্দেহ করিয়া, অলকাকে যদি হত্যা না করিত, প্রতিহিংসার বশবর্ত্তিনী হইয়া, নারীধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া, মালতীর বুকে যদি ছুরিকা না বসাইত, যমুনার চরিত্র আদর্শ চরিত্র হইত। যমুনা পাপে পুণ্যে, কোমলে কঠিনে অপূর্ব্ব রমণী। যমুনার মাতৃভক্তি অসীম—তাহার ভ্রাতৃস্নেহ আদর্শ। তাহার স্বার্থত্যাগ জগতে দুর্লভ।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

উপসংহার।

যথাসময়ে যমুনার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপ্ত হইল। অজয় সরসী যতদিন জীবিত ছিলেন, যমুনাকে বিস্মৃত হইতে পারেন নাই।

সময়ে সরসীর সন্তানাদি হইল। তাহাদের ফুল্লারবিন্দবৎ সুন্দর মুখের সুন্দর হাসিতে চৌধুরীদের বহুকালের বিষাদ-ছায়ালিপ্ত নীরব অট্টালিকা আনন্দকোলাহলে পূর্ণ হইয়া উঠিল।

গিয়াস উদ্দিন রৌশিনারার সহিত অনেক দিবস সেই বনমধ্যে বাস করিল। অবশেষে একদিবস ধৃত হইয়া ফৌজদারের নিকট আনীত হইল। বিচারে তাহার ফাঁসীর হুকুম হইল। রৌশিনারা গ্রামে যাইয়া গণিকাবৃত্তি অবলম্বন করিল। পরিশেষে নানা রোগাক্রান্ত হইয়া, রোগের যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া, উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিল।

সম্পূর্ণ।